মানব সভ্যতার মধ্যযুগ

উষাকান্ত দত্ত



নবভারতী প্রকাশনী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম [Vide Notification No. Syll./79/16Dt. 29. 8. 79] অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত এবং পর্ষদ কর্তৃক T. B. No. VII/H/81/37 Dt. 8. 1.81 দ্বারা অনুমোদিত।

মানব সভ্যতার মধ্যযুগ

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

উষাকান্ত দত্ত, এম. এ., বি. টি. (পদকপ্রাপ্ত)
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার।

নবভারতী প্রকাশনী
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৯

Rs 13.00

প্রকাশক :
আনন্দকুমার পাল
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম মুদ্রণ : মে, ১৯৮০
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি, ১৯৮১
তৃতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৮১
চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৮৪

মূল্য : পর্ষদ নির্ধারিত

মুদ্রাকর :
অমলকৃষ্ণ কুমার
উমাশংকর প্রেস
১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ মুখবন্ধ ॥

প্রথম প্রকাশের দুমাসের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে বইটির সমাদরই প্রমাণ করছে। আর আমি আমার সহৃদয় সহকর্মী শিক্ষকদের জানাই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা তাঁদের এই গভীর আন্তরিক সহযোগিতার জন্য।

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর জন্য একটি ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক রচনা বাজারে অসংখ্য বই প্রচলিত থাকায় পাঠ্যপুস্তকের আবশ্যিক গুণাবলী সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘটায়। ঐ সব শ্রেণীর জন্য বিষয়-বস্তু সংগ্রহটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল সংগৃহীত বিষয়-বস্তুকে ঐ সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে পরিবেশন করা, তাদের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকা এবং বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের কৌতূহলী মনটাকে একটু উস্‌কে দেওয়া। আর এই সব কাজ কখনোই ঐসব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সন্দেহ থাকে না, এই দায়িত্ব পালন করার জন্য ইতিহাস চেনা হবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই কোন বৃহৎ খ্যাতনামা কলেজে অধ্যাপনা করার তকমা। বরং অনেক বেশী অপরিহার্য বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

দ্বিতীয় মুদ্রণের সুযোগে বইটিকে যথেষ্ট সংস্কার করা হল। যে কোন পাঠকই এক নজরে এই সব পরিবর্তন ধরে ফেলতে পারবেন। আমার বিশ্বাস এই সব পরিবর্তন বইটির গুণগত মান উন্নয়নে আরও বেশী সহায়ক হয়েছে।

শ্রীগান্ধারী দত্ত পাণ্ডুলিপি রচনাকালে দশহাত বাড়িয়ে যেভাবে আমাকে অক্লান্ত রেখেছে, জানিনা পরবর্তীকালে এভাবেই সে নিজেকেও উদ্দীপিত করবে কি না। আর আমার প্রকাশক তো স্থির করেই রেখেছেন আমার যে কোন বিচ্যুতি তিনি তাঁর ঔদার্যগুণে মেনে নেবেন।

বইটিকে ক্রমান্বয়ে একেবারে ত্রুটিহীন করে তুলতে সহকর্মী শিক্ষকদের কাছ থেকে যে কোন উপদেশ-নির্দেশ আমি সর্বক্ষণই কামনা করি। এ প্রসঙ্গে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী শ্রীপ্রিয়ব্রত রক্ষিত ও শ্রীসুকুমার বসুকে মনে করতেই হয়। তাঁরা নির্দ্বিধায় আমার তীব্র সমালোচনা করে আমাকে ত্রুটিমুক্ত করতে বাধ্য করেছেন। এ এক অপূর্ব আন্তরিকতার টান!

গ্রন্থকার

কোচবিহার
শিব-চতুর্দশী
১৯৮১

সূচীপত্র

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

মধ্যযুগের পরিচয়

বিষয়-সংকেত ঃ যেমন দিনের আলো ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে, তেমনি মানব সভ্যতার বিভিন্ন যুগও এসেছে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে, আকস্মিকভাবে নয়। এই ভাবেই একদিন আমরা আমাদের সভ্যতার প্রাচীনকাল পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম মধ্যযুগে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেমন করে চিনবো সেই মধ্যযুগকে। এই চেনার উপায় সন্ধান করা হবে এই অধ্যায়ে।

॥ মধ্যযুগের আরম্ভ ॥

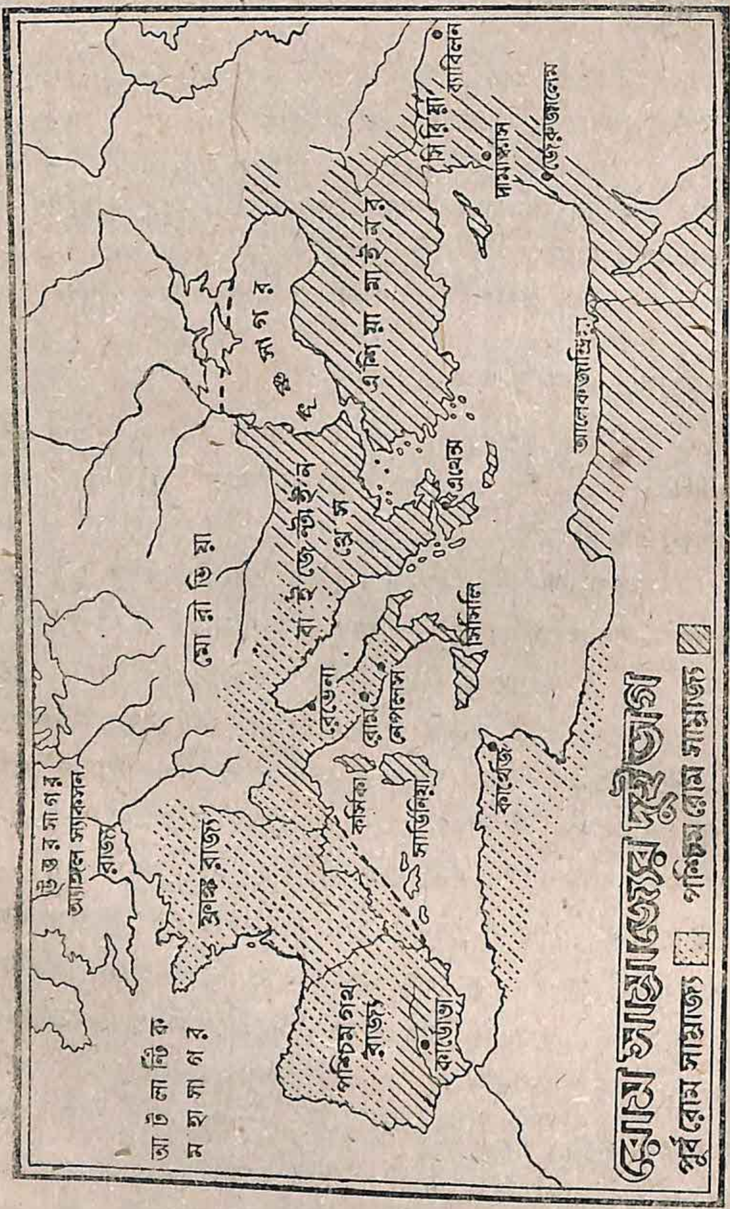
তিন মহাদেশ জুড়ে ছিল বিশাল রোম সাম্রাজ্য। যেমন ছিল তার ধনবল, তেমন ছিল লোকবল। আনন্দ-উল্লাসে পূর্ণ রোম নগরী ছিল যেন এক স্বর্গপুরী।

এমন যে শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্য তাও একদিন ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যায়—পূর্ব রোম সাম্রাজ্য ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে শীঘ্রই নানা গোলযোগ দেখা দেয়। এই গোলযোগের সুযোগে বিভিন্ন দুর্ধর্ষ বর্বর উপজাতি বার বার আক্রমণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সম্রাট রোমুলাসকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। এরই সঙ্গে আরম্ভ হল ইউরোপে মধ্যযুগ।

ইউরোপ

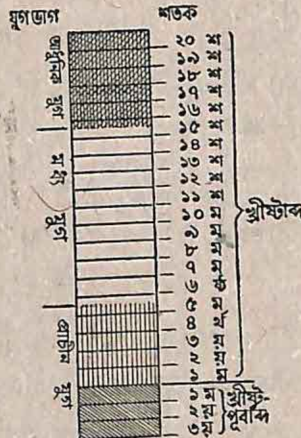
ইউরোপের ইতিহাস যেমন রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের অবসান ও মধ্যযুগের সূত্রপাত বলে চিহ্নিত হয়েছে, তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যযুগের আরম্ভ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। সারা-ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে গুপ্ত সম্রাটগণ যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐক্য নষ্ট হয়ে গিয়ে সারা দেশব্যাপী দেখা গেল বিশৃঙ্খলা আর অনৈক্য।

ভারতবর্ষ


রোম সাম্রাজ্যের দুই ভাগ
পূর্ব রোম সাম্রাজ্য
পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
অ্যাংলো স্যাক্সন রাজ্য
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
পশ্চিম গথ রাজ্য
কার্ডোভা
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
রোম
নেপলস
রেভেনা
সিসিলি
কার্থেজ
মোরাভিয়া
বাইজেন্টাইন
কৃষ্ণ সাগর
এশিয়া মাইনর
এথেন্স
আলেকজান্দ্রিয়া
সিরিয়া
ব্যাবিলন
দামাস্কাস
জেরুজালেম

॥ মধ্যযুগের বিস্তৃতি ॥

হজরত মহম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আরব দেশ সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে দেখা যায় নবজাগরণ এবং ক্রমশঃ তারা পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন জর্ডন, সিরিয়া, মিশর, ইরাণ প্রভৃতি জয় করে। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় দেশ-দেশান্তরে বাণিজ্য। সাথে সাথে ঐ সব দেশের ভাববিনিময় হয় পরস্পরের মধ্যে এবং তারা নতুন সভ্যতায় উন্নত হয়ে ওঠে। আবার এই সময় ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে যুদ্ধ হয়। সেই সুযোগে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র প্রথায় সম্পদ গিয়ে জমা হয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে। আরবের সাথে ইউরোপের যুদ্ধ হলেও কালক্রমে আরবের উন্নত জ্ঞানের প্রভাব পড়ে ইউরোপে এবং সেখানেও উন্নতি শুরু হয় এবং এক নতুন সভ্যতার সূচনা হয়।



পার্শ্বের রেখাচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত হল মধ্যযুগ। সাধারণভাবে এই সময়-সীমাকে আমরা মধ্যযুগ বলে মেনে নিয়েছি।

আবার ঘটনার দিক থেকে বলা যায়, রোম সাম্রাজ্যের পতন থেকে দীর্ঘ সময় ধরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ মানুষের জীবনে সমাজ সম্পর্কে, রাষ্ট্র সম্পর্কে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন এসেছিল।

সাধারণভাবে মধ্যযুগের বিস্তৃতি হল রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত। পশ্চিম দেশে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে এক

নবদিগন্তের সূচনা হল। সেদিন থেকে পৃথিবীর পণ্ডিতরা আধুনিক যুগের সূত্রপাত ধরেছেন।

॥ যুগ বিভাগের লক্ষ্য ॥

মানুষের যে বিশাল সভ্যতা তাকে নির্দিষ্ট কোন সন-তারিখ দিয়ে ভাগ করা যায় না। তবুও আমরা সন-তারিখ ব্যবহার করি আমাদের বোঝার সুবিধের জন্য। মনে রাখতে হবে, যেমন কোন মানুষের পরিবর্তন হঠাৎ করে রাতারাতি ঘটে যায় না তেমনি সেই মানুষের সমাজের পরিবর্তনও হঠাৎ করে ঘটে না। এটা যে কতবড় সত্যি তা আমরা বুঝতে পারি, যখন দেখি সব দেশে পরিবর্তন একই সঙ্গে আসে না। যেমন, ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই সমাজের পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ক্রমশঃ সেই পরিবর্তন এল অষ্টম শতাব্দী নাগাদ। শুধু তাই নয়—বিভিন্ন দেশে যে সব বিভিন্ন পরিবর্তন আসে তাও আবার একই ধরনে, একই চরিত্রে, একই ধারায় কখনো আসে না। বিভিন্ন দেশের নিজস্ব পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনেরও রকমফের ঘটে যায়।

ক্রমিক পরিবর্তন

পরিবর্তনের সময়ে বিভিন্নতা

তবুও প্রত্যেক যুগের এমন কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে যা দিয়ে প্রত্যেকটি যুগকে আলাদা করে চেনা যায়। মধ্যযুগের কথাই ধরা যাক। আমরা দেখেছি কিভাবে ক্রীতদাস-নির্ভর ছিল রোম সাম্রাজ্য। মধ্যযুগে এসে সেই ক্রীতদাস প্রথা ধ্বংস হয়ে গেল ঠিকই, পরিবর্তে এল নতুন ব্যবস্থা, যাকে বলা হয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথা। আবার গোটা মধ্যযুগ জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে মানুষ আপোষহীন লড়াই করেছে। এই লড়াই থেকেই এসেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতাবোধ।

ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ

আবার অন্যদিকে মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক

বিরাট পরিবর্তন এসেছিল মধ্যযুগে। এখন মানুষ অনেক উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি ঘটালো। ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে সচ্ছলতার সম্ভাবনা দেখা গেল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ অনেক এগিয়ে গেল। ছাপানো বই-পত্র এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত বিস্তারকে সহজ করে দিল। সমুদ্র-পথে জাহাজে কম্পাসের ব্যবহার মানুষকে অনেক সাহসী করে তুললো। কেননা, এখন আর বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রে হারিয়ে যাবার ভয় থাকলো না। এই সুযোগেই মানুষ অনেক নতুন নতুন স্থলভাগ আবিষ্কার করে ফেললো। ফলে মানুষের দেখার জগৎ এবং চিন্তার জগং যে কতটা বিস্তৃত হয়ে গেল তা ভাবা যায় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই নানা পরিবর্তনের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে মানব সভ্যতার মধ্যযুগ।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়কাল হল মধ্যযুগ। এই যুগে ক্রীতদাস প্রথার পরিবর্তে এলো সামন্ততন্ত্র। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মানুষ ক্রমশঃ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে শিখলো।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। সাধারণভাবে মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি? সময়-সীমার কোন সময়কে মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করা যায়?

২। কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমরা মধ্যযুগকে আলাদা করে চিনতে পারি?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফল কি হল ?

২। বিভিন্ন দেশের পরিবর্তন একই সঙ্গে একই ধরনের হয় না কেন ?

৩। মধ্যযুগে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বেড়ে গেল কেন ?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) মধ্যযুগে ক্রীতদাস প্রথার পরিবর্তে এল —— প্রথা।

(খ) ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ এল —— শতাব্দী নাগাদ।

(গ) —— মানুষের জ্ঞানকে দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করলো।

(ঘ) জাহাজে —— ব্যবহার মানুষকে সাহসী করে তুললো।

(ঙ) হজরত মহম্মদ প্রচারিত —— ধর্ম আরব দেশকে সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে।

২। নীচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে শুদ্ধ করে লিখ :—

(ক) শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্য শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়।

(খ) ক্রীতদাস প্রথায় সম্পদ গিয়ে জমা হয় মুষ্টিমেয় কয়েক জনের হাতে।

(গ) প্রত্যেক দেশে পরিবর্তন একই সঙ্গে একই ধারায় আসে।

(ঘ) ব্যক্তি-স্বাধীনতা বোধ থেকেই এল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। শেষ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্য কয়ভাগে বিভক্ত হয় ?

২। কত খ্রীষ্টাব্দে শেষ রোম সম্রাট সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হন ?

৩। কোন্ সাম্রাজ্যের পতন থেকে ভারতে মধ্যযুগের আরম্ভ বলে ধরা হয় ?

৪। কোন্ মহাদেশের আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে নবদিগন্তের সূচনা করে ?

৫। ঐ মহাদেশ কে আবিষ্কার করেছিলেন ?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

——

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

ইউরোপের মধ্যযুগের সূত্রপাত

বিষয়-সংকেত ঃ যুগে যুগে বার বারই দেখা যায় এক বিশাল সাম্রাজ্য যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন তার ভগ্নাংশ নিয়ে পড়ে যায় কাড়াকাড়ি, শুরু হয় দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা এবং অশান্তি। আমরা এবার দেখবো, ধ্বংসপ্রায় রোম সাম্রাজ্যের ভাগাভাগি নিয়ে বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের মধ্যে সে কি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা !

॥ জার্মানদের পরিচয় ॥

বিশাল রোম সাম্রাজ্যের শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর একটা বিশেষত্ব ছিল। তা হল এই বাহিনীতে রোমের লোক ছিল খুবই কম। উত্তর দেশের গথ, ভ্যাণ্ডেল প্রভৃতি দুর্ধর্ষ উপজাতিদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনী। এদের কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে বেঁধে রাখা হত। তাই তাদের জীবনে দারিদ্র ছিল অসহনীয়। তাই মনে মনে তারা ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল আর যখন বিলাস-ব্যাভিচারে রোম সাম্রাজ্য ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল তখন তারা দেখলো এই সুযোগ। ফলে উত্তর দিক থেকে গথ এবং দক্ষিণ দিক থেকে ভ্যাণ্ডেলগণ রোম আক্রমণ করলো।

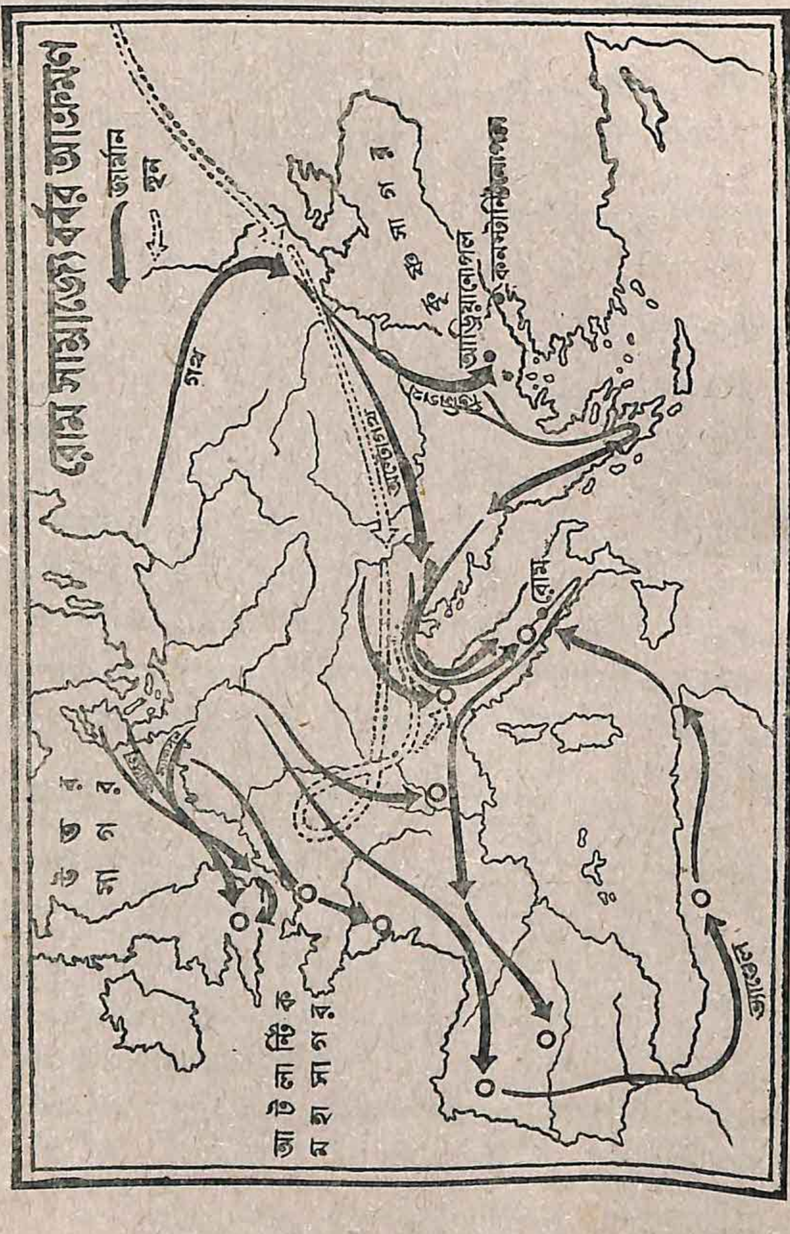
প্রাথমিক পরিচয়

এই সব উপজাতিদের রোমানরা বলতো বর্বর জার্মান। জার্মানরা কিন্তু নিজেদের পবিত্র আর্যজাতি বলে পরিচয় দেয়। তাদের মতে, আর্যদের টিউটন নামে এক শাখা আজকের জার্মানীর উত্তরাংশে বসতি স্থাপন করে। তারা পরবর্তীকালে এ্যাংগল, স্যাক্সন, জুট, গথ, ভ্যাণ্ডেল প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। ঐ টিউটন আর্যদের এত বিস্তার দেখে রোমানগণ তাদের জার্মান বলতো। জার্মান কথাটা এল 'জার্ম' অর্থাৎ জীবাণু থেকে।

বিভিন্ন উপজাতির পরিচয়

॥ হুনদের পরিচয় ॥

রোম সাম্রাজ্যের অন্তিম অবস্থায় বিভিন্ন জার্মান উপজাতিগণ যখন


রোম সাম্রাজ্যে বর্বর আক্রমণ
জার্মান
হুন
রোম

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছিল, ঠিক সেই সময় এশিয়া মহাদেশ থেকে এসে উপস্থিত হল এক অতি নিষ্ঠুর ও দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি—ইতিহাসে যাদের পরিচয় হল হুন নামে। এদের পা ছিল ছোট ছোট, নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রং হলুদ। অনায়াসে এরা দিনের পর দিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেড়াতে পারতো। এদের খাদ্য ছিল কাঁচা মাংস আর ঘোড়ার দুধ। খাদ্যের সন্ধানে এরা দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াত। এদের অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক।

চরিত্র



এটিলা ও হুন

হুনদের আদি বাসস্থান ছিল চীনের উত্তরে মঙ্গোলিয়ায়। সেখানে তারা মাঝে মাঝেই চীনদেশ আক্রমণ করে ঐ দেশকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তখন চীনের সম্রাটগণ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে হুনগণ এশিয়া মহাদেশ থেকে ইউরোপে সরে আসতে বাধ্য হয়।

আদিবাস

এদের আক্রমণের মুখে পড়েই মধ্য ইউরোপের পশ্চিমাংশে বসবাসকারীগণ, যাদের বলা হত **ভিসিগথ**, ক্রমশঃ রোমের দিকে সরে যেতে লাগল। ফলে আরম্ভ হল রোম ধ্বংসের পালা। হুনেরা যত এদের ওপর চাপ দেয়, ততই ভিসিগথরা চাপ দেয় রোমের ওপর। শেষ পর্যন্ত ভিসিগথদের রাজা **এলারিক** আল্পস্ পর্বত পার হয়ে ইটালী আক্রমণ করলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এলারিক রোম অধিকার করে নেন। তারপর তিনি সিসিলির দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি জীবনে খ্রীষ্টান গির্জাগুলোকে সর্বদাই শ্রদ্ধা করতেন এবং এগুলো কখনই লুঠ করেন নি।

ইউরোপে প্রবেশ

এলারিকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আর এক জার্মান উপজাতি ভ্যাণ্ডেলগণ রোম সাম্রাজ্য দখল করতে উদ্যত হয়। তারা গল বা আজকের ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের বড় বড় শহরগুলো দখল করে স্পেনের দিকে অগ্রসর হয়। ঠিক এই সময় ভিসিগথরাও স্পেনে এসে ঢুকলে ভ্যাণ্ডেলরা উত্তর আফ্রিকায় চলে যায়।

ভ্যাণ্ডেলদের পরিচয়

উত্তর আফ্রিকায় থাকাকালীন ভ্যাণ্ডেলদের রাজা ছিলেন গাই-সারিক। তিনি ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তিনি কার্থেজ দিয়ে রোম আক্রমণ করতে উদ্যত হলে রোম সম্রাট উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডেলদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। গাইসারিক এতেও খুশী হলেন না। তিনি ভূমধ্যসাগর পার হয়ে রোম আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ রোমের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। ব্যাপক হত্যা আর লুণ্ঠনে রোম প্রায় শ্মশানে পরিণত হল।

গাইসারিক

ভ্যাণ্ডেলদের পর রোমকে শেষ আঘাত হানলেন হুনরাজ এটিলা। ফ্রান্স ও ইটালীতে ব্যাপকভাবে হত্যা লুণ্ঠন করে এটিলা এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। চালোন্স-এর যুদ্ধে রোমান ও গথরা একত্রে এটিলাকে পরাজিত করলেও ইউরোপের

এটিলা

এক বিরাট এলাকা জুড়ে ছিল তাঁর প্রাধান্য। এমন কি এটিলার মৃত্যুর পরেও হুনরা ইউরোপ ত্যাগ করে যায় নি। এটিলাকে ইউরোপবাসীরা ভগবানের অভিশাপ বলে মনে করে। এলারিকের মত এটিলাও পোপের অনুরোধে রোম নগর লুটপাট করেন নি।

চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই জার্মান উপজাতিসমূহ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ করছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। যেমন উত্তর আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডেলগণ, স্পেনে ভিসিগথ, বৃটেনে অ্যাংগল ও স্যাকসন, গলে ফ্রাংক, ইটালীতে অস্ট্রোগথগণ ইত্যাদি।

একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল, রোম সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী জার্মানদের এই অধিকারকে মেনে নিয়েছিল। কারণ তারা চেয়েছিল রোমান শাসনের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি। জার্মান উপজাতিদের আক্রমণের ফলেই ক্রীতদাস প্রথা ধ্বংস হয়ে গেল। ক্রীতদাস মালিকরা তাদের ধন-সম্পদ সবই হারালো।

॥ জার্মানদের জীবনযাত্রা ॥

জার্মান উপজাতিদের বর্বর বলা হলেও তারা কিন্তু সত্যি সত্যিই বর্বর ছিল না। তারা ছিল লম্বা-চওড়া এক শক্তিশালী জাতি। কৃষি ও পশুচারণ ক্ষেত্রের মধ্যেই গড়ে উঠতো তাদের এক-একটা পল্লী।

চরিত্র

তাদের বাড়ীঘর ছিল গাছের পাতা দিয়ে তৈরী। তাদের গ্রামের চারদিকে কাঠের মজবুত খুঁটি দিয়ে ঘিরে সুরক্ষার ব্যবস্থা হত।

জার্মানদের প্রধান বৃত্তি ছিল পশুপালন শিকার। চাষের কাজ

জীবিকা

তারা করতো, কিন্তু এ কাজ তারা খুব বেশী পছন্দ করতো না। আপেল ফলের চাষ তারা বিশেষ যত্ন নিয়ে করতো। গৃহপালিত জীবের মধ্যে প্রধান ছিল গরু, ঘোড়া, ভেড়া এবং কুকুর। তীর-ধনুক ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র।

যুদ্ধক্ষেত্রে তারা ঘোড়া ব্যবহার করতো। পাশা খেলা ছিল তাদের খুবই প্রিয়।

জার্মানদের সমাজ ছিল পিতৃশাসিত। তাদের পরিবারের প্রধান ছিল পিতা। নিজের দেশকে তারা বলতো পিতৃভূমি। তাদের গ্রাম্য জীবনের পরিচালনা-ভার ছিল কয়েকজন সর্দারের ওপর। কতকগুলো পল্লী নিয়ে গঠিত হত 'হানড্রেড' অর্থাৎ 'একশ' পল্লীর সমবায়। সমস্ত পল্লী থেকে আবার কয়েকজন বড় সর্দার 'হানড্রেড' শাসন করার দায়িত্ব গ্রহণ করতো।

রাজনৈতিক জীবন

'হানড্রেডের' ওপরে থাকতো প্রত্যেক উপজাতিদের নিজস্ব রাজ্য। রাজাকে সাহায্য করার জন্য থাকতো সভা ও সমিতি। সভা ছিল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দিয়ে গঠিত আর সমিতি ছিল সাধারণ মানুষদের নিয়ে গড়া। জার্মানদের সমাজে আর এক শ্রেণীর লোক ছিল : এদের বলা হত সার্ফ বা ভূমিদাস। এদের কাজ ছিল জার্মান নাগরিকদের সেবা করা। মেয়েরা ছিল গৃহের কর্ত্রী।

জার্মানরা ছিল নানা দেবদেবীর উপাসক। তাদের টুই, ওডিন, থর প্রভৃতি দেবতার নাম থেকেই ইংরেজী টুইস-ডে, ওয়েনজ-ডে, থার্স-ডে প্রভৃতি বারের নাম হয়েছে। ইংরেজরা হল জার্মানদেরই বংশধর। পরবর্তীকালে জার্মানরা খ্রীষ্টান ধর্মের সংস্পর্শে আসে এবং কালক্রমে তারা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

ধর্মীয় জীবন

এই সঙ্গে আর এক কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। জার্মানরা রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেও তারা তাদের অস্তিত্বের তেমন প্রমাণ রাখতে পারে নি। তাই দেখা যায়, যে সব অঞ্চলে তারা বসবাস করতো সে সব অঞ্চলেও রোমান আইন, রোমান রীতি-নীতির প্রভাব থেকেই গিয়েছিল। তাদের নিজস্ব সভ্যতা থাকলেও তারা রোমান সভ্যতার দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হয়। অবশ্য তাদের জমি বন্দোবস্তের যে প্রথা ছিল তার সঙ্গে রোমান

প্রথার মিশ্রণের ফলেই সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয়। আবার ধর্মের ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ত্যাগ করে রোমানদের ধর্ম খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

ক্ষয়িষ্ণু রোম সাম্রাজ্যের ওপর শেষ আঘাত হানে বিভিন্ন জার্মান উপজাতি। এই সব উপজাতিদের প্রধান হল হুন, গথ, ভ্যাণ্ডেল। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য যোদ্ধা হলেন, হুনরাজ, এটিলা, ভিসিগথদের রাজা এলারিক এবং ভ্যাণ্ডেলদের রাজা গাইসরিক। এরা রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ হলেও এদের উপর রোমান সভ্যতার প্রভাব-ই ছিল বেশী।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। জার্মান শব্দটি বলতে কি বোঝায়? জার্মান শব্দটি কেমন করে এল?

২। ইউরোপীয়রা কাকে বলতো ভগবানের অভিশাপ? কেন-ই বা তারা এরকম বলতো? এরকম বলাটা কি তোমার ঠিক মনে হয়?

৩। হুনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? কেন তারা অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়?

৪। জার্মানদের সমাজ-শাসন কেমন ছিল? কিভাবে এই শাসন পরিচালনা করা হয়?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

টিউটন, এলারিক, সার্ফ, হানড্রেড।

২। সামন্ত প্রথার উদ্ভব হয় কিভাবে?

৩। জার্মান পল্লী গড়ে উঠতো কিভাবে?

৪। রোমানগণ জার্মান উপজাতিদের অধিকার মেনে নিয়েছিল কেন?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নীচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লেখ :—

(ক) রোমান সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ রোমান ছিল।

(খ) ইউরোপের পূর্বাংশে বসবাসকারীদের বলা হত ভিসিগথ।

(গ) ভ্যাণ্ডেলদের সর্দারের নাম ছিল এলারিক।

(ঘ) চালোন্‌স-এর যুদ্ধে রোমান ও গথরা একত্রে গাইসারিককে পরাজিত করেছিল।

(ঙ) কমলালেবু ফলের চাষ জার্মানদের খুব প্রিয় ছিল।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) —— দের কাজ ছিল জার্মান নাগরিকদের সেবা করা।

(খ) পরবর্তীকালে জার্মানরা —— ধর্ম গ্রহণ করে।

(গ) —— খেলা ছিল জার্মানদের খুব প্রিয়।

(ঘ) —— বলতে বোঝায় আজকের ফ্রান্স ও বেলজিয়ামকে।

(ঙ) এলারিক —— দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে মারা যান।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। এলারিক কি পোপকে খুব শ্রদ্ধা করতেন ?

২। এটিলা রোম লুণ্ঠন করেন নি কেন ?

৩। কোন্ উপজাতির পা ছিল ছোট, নাক চ্যাপ্টা আর গায়ের রঙ হলুদ ?

৪। ভ্যাণ্ডেলরা উত্তরদিকে আফ্রিকায় চলে যায় কেন ?

৫। গাইসারিক কিভাবে রোম আক্রমণ করেন ?

———

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

অন্ধকার যুগের কথা

বিষয়-সংকেত ঃ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়/আড়ালে তার সূর্য হাসে"। কবির এই কথা কেবল কোন মানুষের ক্ষেত্রেই যে সত্য তা নয়, সত্য মানুষের সভ্যতার ক্ষেত্রেও। মানুষের এগিয়ে যাবার পথে কখনো কখনো এমন সংকট সৃষ্টি হয়েছে যে মনে হয়েছে আর বুঝি কোন পথ নেই। এমনি এক সংকটময় সময়ের কথা এবার আমরা জানব।

সময়কাল

মানুষের সভ্যতার একটা সময়কে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন অন্ধকার যুগ বলে। সন-তারিখের হিসেবে তাদের মত হল চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী এই অন্ধকার যুগের সময়কাল।

বিবরণের অভাব

এই যে সময়টাকে অন্ধকার যুগ বলা হয় তার সবচেয়ে বড় কারণ হল এই সময়ের কোন সুস্পষ্ট ইতিহাস জানা যায় না। একান্ত অভাব হল এই সময়কার কোন লিখিত বিবরণের। সুতরাং যে সময়ের কথা আমরা স্পষ্ট করে জানতে পারি না, জোর দিয়ে বলতে পারি না, সেই সময় একদিক থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বৈকি!

শিক্ষার অভাব

এ ছাড়াও রয়েছে আর একটি বড় কারণ। এই সময় মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সুযোগ ছিল খুবই কম। রোম সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে যাবার পর দেশে শান্তি-শৃঙ্খলাও নষ্ট হয়ে যায়। উপজাতিদের বার বার আক্রমণ আর লুটতরাজের ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাই তখন বিজ্ঞানের চর্চার সুযোগও ছিল না। যতটুকুও বা ছিল তা ছিল তখনকার দিনে সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রচার ও প্রসার প্রায় ছিলই না বলা যায়। আর সাধারণ মানুষও লেখাপড়া শেখার খুব একটা তাগিদ বোধ করতো না। কারণ তখন

তাদের প্রধান কাজই ছিল যুদ্ধ করা। আর এ কাজের জন্য লেখাপড়া শেখার তো কোন প্রয়োজনই ছিল না। তাই এই সময়টা কাটিয়েছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে। এদিক থেকেও বলা যায় সভ্যতার ইতিহাসে এই হল অন্ধকার যুগের সময়।

॥ অন্ধকার যুগের অন্যদিক ॥

যদিও অন্ধকার যুগে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার খুব একটা প্রচলন ছিল না, তথাপি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাও ঠিক নয়। তখনকার দিনে সাধু-সন্ন্যাসীরা জ্ঞান অর্জনের চেষ্টাকে অব্যাহত রেখে ছিলেন। সে সময় তো ছাপাখানা ছিল না। সাধু-সন্ন্যাসীরা বই-পত্র হাতে লিখে বিদ্যাচর্চাকে ধরে রেখেছিলেন। অবশ্য তাঁরা এসব কাজ করতেন নিজেদেরই স্বার্থে। কারণ তাঁদের আসল কর্তব্য ছিল ধর্মের প্রচার আর ধর্ম প্রচারের কাজ জ্ঞান অর্জন না করে, করা সহজ ছিল না।

সাধুদের চেষ্টা



একজন মঙ্ক

শুধু লেখাপড়ার ক্ষেত্রেই নয়, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা, মানুষের উপকার করা —এই সব মহৎ গুণের শিক্ষা সাধারণ মানুষকে শিখিয়েছিলেন সাধু-সন্ন্যাসীরা। সন্ন্যাসীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, তাঁদের ত্যাগ ও ভালবাসার আদর্শ এলারিক বা এটিলার মত নিষ্ঠুর যোদ্ধাদেরও মুগ্ধ করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে যখন দেশের যুদ্ধপ্রিয় রাজারা লেখা-পড়া আদৌ পছন্দ করতেন না, তখন সাধু-সন্ন্যাসীরা বিদ্যাচর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। লোক চক্ষুর বাইরে বসে তাঁরা ল্যাটিন, গ্রীক সাহিত্য-বিজ্ঞানের পুঁথি নকল করে জনগণের মধ্যে প্রচার

একজন মঙ্ক

করতেন। এবং তাঁরা তা করেছিলেন বলেই সময়টা সত্যি সত্যিই একেবারে অন্ধকার হয়ে যায় নি। তাঁদের চেষ্টার ফলেই এ সময়ের কিছু কিছু কথা এখন আমরা জানতে পারি।

॥ **এই যুগে ধর্মীয় সংঘের অবদান** ॥

এই সব সাধু-সন্ন্যাসীরা ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। এঁরা সাধারণতঃ জনবহুল জয়গায় থাকতেন না। কারণ তখনকার দিনে এইসব স্থান সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহের আশংকায় আতংকগ্রস্ত। এ রকম জায়গা ভগবানের উপাসনার পক্ষে সুবিধা-জনক নয়। তাই তাঁরা লোকালয়ের বাইরে নির্জন ও শান্তিময় স্থান বাসস্থানের জন্য খুঁজে নিতেন। সে রকম জায়গাতেই তাঁরা গড়ে তুললেন নিজেদের বাসস্থান, অনেকটা আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিদের তপোবনের মত। এই সব বাসস্থানকেই বলা হয় মনাস্টারি বা ধর্মীয় সংঘ। আবার এইসব সংঘেই পথ চলতে পথিকেরা আশ্রয় পেতো। কেননা তখনকার দিনে তো আজকের মত হোটেল ছিল না। এই আশ্রয় সাধারণ মানুষের মনে সংঘগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

সংঘ গঠন

এই সব সংঘ আক্রমণকারাদেরও আক্রমণের লক্ষ্য হত না। কেননা আক্রমণকারীরা ভাল করেই জানতো, সংঘে কখনো প্রচুর ধনরত্ন বা খাদ্য লুকানো থাকতো না। থাকতো কিছু সন্ন্যাসী আর তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থ। এগুলোর উপর আক্রমণকারী-দের কোন লোভই ছিল না।

নিরাপদ সংঘ

এভাবে ধর্মীয় সংঘগুলো লোকচক্ষুর বাইরে নির্জনে গড়ে ওঠার সুযোগে মধ্যযুগের এই সময়টায় যতটুকুওবা সংস্কৃতি চর্চার সুবিধে ছিল তার সংরক্ষণকেন্দ্রে পরিণত হয়। সন্ন্যাসীরা দেখলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রত করার জন্য ব্যাপকভাবে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার প্রয়োজন আর এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য চাই যথেষ্ট সংখ্যক ধর্ম প্রচারক। আবার

বিদ্যালয় স্থাপন

ধর্ম প্রচারক হতে গেলে দরকার উপযুক্ত শিক্ষার। তাই সন্ন্যাসীগণ নিজেদের সংঘের সঙ্গে প্রচারক তৈরীর উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন করতে লাগলেন।

এই সব বিদ্যালয়ে পড়ানো হত খ্রীষ্টান ধর্মের নানা বিষয়। ক্রমশঃ মানুষ এইসব বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মের নীতিবোধ প্রচারিত হতে লাগলো।

বিদ্যালয়ে শিক্ষা

শান্তি ও শৃংখলা সন্ন্যাসীদের জীবনধারণের যে আদর্শ—সৎ জীবনযাপন, বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা, মানুষের উপকার করা ইত্যাদি, সাধারণ মানুষকেও অনুপ্রাণিত করতে লাগলো।

বিশেষ করে জার্মান উপজাতিদের উপর এইসব সাধু-সন্ন্যাসীরা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এঁদের সংস্পর্শে এসেই উপজাতিগণ ক্ষমা, উদারতা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা তারা ত্যাগ করে। অকারণ যুদ্ধ করার মনোভাব তারা বর্জন করে। এক কথায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে উপজাতিগণ এক নতুন নীতিবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

তাই আমরা বলতে পারি, সাধারণভাবে মানুষের সভ্যতার যে সময়টাকে আমাদের অন্ধকার যুগ বলে মনে হয় তা আসলে অন্ধকার যুগ ছিল না। বরং বলা যায়, নীরবে নির্জনে মানুষ এই সময়েও এগিয়ে যাবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল বলেই আপাততঃ তার সম্মুখে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা সে পেরিয়ে আসতে পেরেছিল।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

রাজনৈতিক বিশৃংখলায়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার অভাবে চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী এই সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়। কিন্তু খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় এই অন্ধকার সময়েও আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। মানুষের সভ্যতার কোন সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়? এই যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয় কেন?

২। অন্ধকার যুগে লেখাপড়া চর্চা করতেন কারা? সাধারণ মানুষ লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিল না কেন?

৩। অন্ধকার যুগেও সন্ন্যাসীরা আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন কিভাবে?

৪। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা কিভাবে জার্মান উপজাতিদের প্রভাবিত করেছিলেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। কোন্ সময়কে অন্ধকার যুগ বলা হয়?

২। এই সময়ে সাধারণ মানুষের প্রধান কাজ কি ছিল?

৩। সাধু-সন্ন্যাসীরা লেখাপড়ার চর্চা করতেন কেন?

৪। উপজাতিগণ সন্ন্যাসীদের কোন্ কোন্ আদর্শে মুগ্ধ হয়েছিল?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নীচের প্রশ্নগুলির পাশে বন্ধনীর মধ্যে উত্তর দেওয়া আছে। ঠিক উত্তরটি খুঁজে বের কর :—

(ক) সন্ন্যাসীরা বাস করতেন কোথায়?
(বনে, সংঘে, লোকালয়ে, প্রাসাদে)

(খ) সন্ন্যাসীরা বিদ্যাচর্চা করতেন কেন?
(প্রচারক তৈরী করবেন বলে, সাধারণ লোককে শিক্ষা দেবেন বলে, নিজেরা জ্ঞানী হবেন বলে)।

(গ) সন্ন্যাসীদের মতে অন্ধকার থেকে মুক্তির উপায় কি?
(খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার, যুদ্ধের সাহায্যে দেশজয়, লোককে শিক্ষিত করা)।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) সন্ন্যাসীদের বাসস্থানকে বলা হয় —।

(খ) ধর্ম প্রচারক হবার জন্য প্রয়োজন —।

(গ) সংঘ-বিদ্যালয়ে পড়ানো হত —।

(ঘ) সন্ন্যাসীদের — সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত করে।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। মনাস্টারি কি?

২। তখনকার পথিকেরা কোথায় আশ্রয় পেত?

৩। সন্ন্যাসীদের মতে মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রত করার জন্য কি প্রয়োজন?

৪। অন্ধকার যুগের সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না কেন?

৫। তখনকার সাধু-সন্ন্যাসীরা বই হাতে লিখতেন কেন?

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

বাইজেণ্টাইন সভ্যতা

বিষয়-সংকেত : সভ্যতার গতি খরস্রোতা নদীর মত। এ কূল ভাঙ্গে তো অন্য কূল গড়ে তোলে। দুই ভাগে বিভক্ত রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ যখন ক্রমশঃ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল, তখন পূর্বাংশে গড়ে উঠছিল চোখ ধাঁধানো এক নতুন সভ্যতা। এই অধ্যায়ে আমরা এই অভিনব সভ্যতার সঙ্গেই পরিচিত হই।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য যখন বিভিন্ন জার্মান উপজাতিদের আক্রমণ এবং ক্রীতদাসদের বিদ্রোহে প্রায় ধ্বংসোন্মুখ, তখনও পূর্ব রোম সাম্রাজ্য আপন শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে গৌরবোজ্জ্বল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের এই কৃতিত্বের জন্য সম্রাট কন্‌সটানটাইনের অবদান অপরিসীম।

॥ কন্‌সটানটাইন ॥

কন্‌সটানটাইন ছিলেন একজন বিশেষ খ্যাতিমান সেনাপতি। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। চরিত্রের দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতা-লোলুপ, নিষ্ঠুর এবং বিশ্বাসঘাতক প্রকৃতির। পাছে তাঁর নিজ পুত্র তাঁকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে এই ভয়ে তিনি তাঁর পুত্রকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অপরাজেয়।

নতুন রাজধানী নির্মাণ

এই অঞ্চলে বসফরাস প্রণালীর পাশে অবস্থিত ছিল বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজেণ্টাইন। এই প্রাচীন শহরেই কন্‌সটানটাইন গড়ে তোলেন তাঁর নতুন রাজধানী। তাঁর নাম অনুসারেই রাজধানীর নাম হয় কনস্টান্টিনোপল। এই নতুন রাজধানী নির্মাণে কন্‌সটানটাইন যথেষ্ট রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন রাজধানীর সুরক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন সাম্রাজ্য কখনো স্থায়িত্ব

অর্জন করতে পারে না। তাই তিনি সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে তুর্গ নির্মাণ করে তাঁর রাজধানীর জন্য এমন সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন যে সেই ব্যবস্থা ভেদ করে রাজধানীর ভেতরে প্রবেশ করা হূনদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। শুধু তাই নয়—কনস্টান্টিনোপলের অবস্থিতিও ছিল এক চমৎকার জায়গায়। কেননা কন্‌স্টান্টিনোপল ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থান এবং এখান থেকে সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে নজর রাখা ছিল খুবই সুবিধা-জনক। তাছাড়া মিশর, ইউক্রেন থেকে খাদ্য



কন্‌সটানটাইন

আমদানী করারও সুবিধে ছিল। দেশের লোকজনও ছিল খুবই অনুগত। তার থেকেও বড় কথা, প্রাচীনকাল থেকেই এই জায়গাটি বাণিজ্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিল।

সুতরাং কন্‌সটানটাইন যে এমন জায়গাকে এক চমকপ্রদ শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাইবেন তাতো খুবই স্বাভাবিক। সারা দেশের ধনসম্পদ তিনি তাঁর নতুন রাজধানী গড়ে তুলতে অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যে গড়ে উঠেছিল কনস্টান্টিনোপল। প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজেন্টাইন গড়ে উঠল কনস্টান্টিনোপল নামে সম্পূর্ণ এক নতুন সাজে।

কন্‌সটানটাইনের আর একটি চমৎকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হল খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ। তখন পর্যন্ত খ্রীষ্টান ধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না। বরং প্রধানতঃ ক্রীতদাসদের ধর্ম বলেই পরিচিত ছিল। অভিজাতরা তো খ্রীষ্টান ধর্মের বিরোধীই ছিল। কারণ এই ধর্ম রাজাকে ভগবান জ্ঞানে সেবা করতে শেখাতো না। আর বিশ্বাস করতো অহিংসায়, ফলে সৈন্যবাহিনীতে সাধারণ লোকের যোগদান তারা চাইতো না।

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ

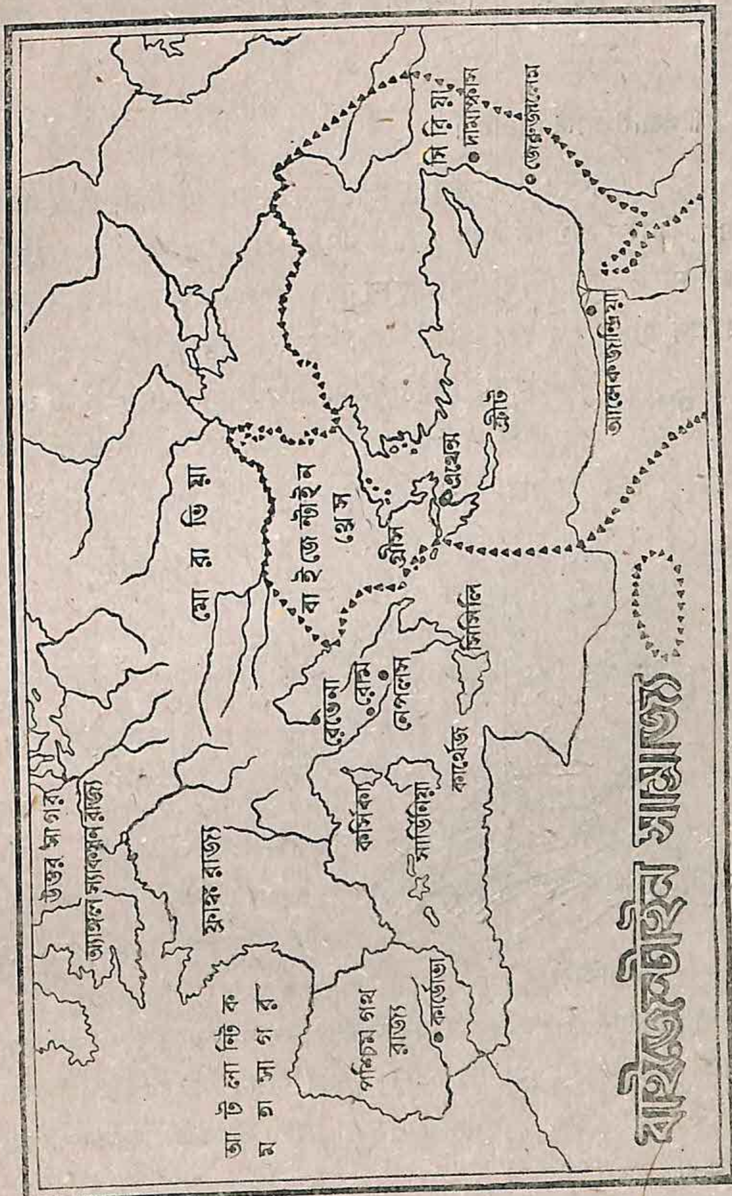
এ সব সত্ত্বেও কন্‌সটানটাইন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন খ্রীষ্টান ধর্ম-বিরোধীদের সংখ্যা অনেক বেশী হলেও তারা ছিল খুবই বিশৃঙ্খল। অন্যদিকে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা ছিলেন অনেক বেশী ঐক্যবদ্ধ। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খল বহুর চেয়ে সুশৃঙ্খল অল্প অনেক ভাল। তাছাড়া কন্‌সটানটাইন আরও দেখেছিলেন, দেশের অধিকাংশ দরিদ্র সাধারণ মানুষ এবং ক্রীতদাসগণ ছিল খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। সুতরাং এই ধর্ম গ্রহণের অর্থ হল এই সব মানুষের আনুগত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া এবং কন্‌সটানটাইন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তাই হতে চেয়েছিলেন।

গ্রহণের কারণ

তিনি খ্রীষ্টানদের প্রকাশ্যভাবে গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি দেন। তিনি নিজে ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা গির্জাকে জমি ও অর্থ দান করেন। এর বিনিময়ে যাজকরাও সাধারণ মানুষকে বিনা প্রশ্নে সম্রাটকে মেনে নেবার জন্যে বলতে লাগলেন। তাঁরা বোঝাতে লাগলেন, সম্রাটরা ভগবানের কাছ থেকে সব শক্তি পেয়ে থাকেন। তারা কন্‌সটানটাইনকে একজন সাধু বলে প্রচার করতে লাগলেন।

যাই হোক সম্রাট কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার ফলে খ্রীষ্টান ধর্মের দ্রুত প্রচার সম্ভব হল। দেশের রাজার সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক তৈরি হল। ফলে ধর্মীয় ব্যাপার পরিচালনার ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ এল অনেক পরিবর্তন। রাজনীতির

ফলাফল


বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য
উত্তর সাগর
অ্যাঙ্গল স্যাক্সন রাজ্য
ফ্রাঙ্ক রাজ্য
আটলান্টিক মহাসাগর
পশ্চিম গথ রাজ্য
কার্ডোভা
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
রেভেনা
রোম
নেপলস
সিসিলি
কার্থেজ
মোরাভিয়া
বাইজেন্টাইন
গ্রীস
এথেন্স
ক্রীট
আলেকজান্দ্রিয়া
জেরুজালেম
দামাস্কাস
সিরিয়া

প্রয়োজনে মানুষের ধর্মীয় দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা আরম্ভ হয়।

॥ সম্রাট জাস্টিনিয়ান ॥

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাস্টিন নামে একজন নিরক্ষর সৈনিক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দখল করে নেন। তাঁর নিজের কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালন-পালন করেন। এই ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন পরবর্তীকালের সম্রাট জাস্টিনিয়ান। অল্প বয়স থেকেই জাস্টিনিয়ান রাজকার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ফলে দেশশাসন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং নিজেকে তৈরী করার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। জাস্টিনের মৃত্যু হয় ৪৫ বৎসর বয়সে। তারপর সিংহাসনে বসেন জাস্টিনিয়ান।

প্রথম জীবন



জাস্টিনিয়ান

জাস্টিনিয়ান থিওডোরা নামে এক মহিলাকে বিবাহ করে ছিলেন। থিওডোরা ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি তেজস্বিনী এবং সদাশয়া। দীর্ঘ একুশ বৎসর তিনি তাঁর স্বামীকে দেশশাসন করতে আপ্রাণ সাহায্য করে গিয়েছেন।

জাস্টিনিয়ান নিজেও ছিলেন নানা গুণের অধিকারী। স্থাপত্য, সংগীত, আইন ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। গরীবদের সম্পর্কে তাঁর ছিল অশেষ সহানুভূতি আর নিজেও ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী।

পত্নী ছাড়া জাস্টিনিয়ান পেয়েছিলেন আর একজন মহাপরাক্রমশালী সেনাপতি। তাঁর নাম বেলাসেরিয়াস। রাজধানীতে দাঙ্গা দমনে,

পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধে, আফ্রিকার খ্রীষ্টধর্ম বিরোধীদের বিদ্রোহ দমনে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এ কথা অনায়াসেই বলা যায় বেলাসেরিয়াসের সাফল্যেই জাস্টিনিয়ান যথেষ্ট গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর শাসনকালের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ চলেছিল পারস্যের সঙ্গে। যুদ্ধ দীর্ঘকাল চললেও কোন পক্ষেই বিশেষ সুবিধে করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে এক সন্ধি স্থাপিত হয় এবং যুদ্ধের অবসান ঘটে।

রাজ্যজয়



সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও তাঁর সভাসদগণ

যাই হোক রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে রোমের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার যে উচ্চাশা জাস্টিনিয়ানের ছিল তা অসম্পূর্ণ ই থেকে যায়। এ কথা ঠিক তিনি আফ্রিকা, ইটালী এবং স্পেন জয় করেছিলেন। কিন্তু এমন বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করাও ছিল একটা সমস্যা। কারণ রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় করার আগে পূর্বাংশের সাম্রাজ্য রক্ষা করাটাই ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছিল। বরং কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে বিব্রত থাকায় রাজকোষ নিঃশেষিত হচ্ছিল।

॥ জাস্টিনিয়ানের আইন ॥

কিন্তু এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও জাস্টিনিয়ান চিরকাল ইতিহাসে অমর হয়ে

থাকবেন। তার কারণ তিনি আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করেন। এতকাল পর্যন্ত রোমান আইনে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল না। জাস্টিনিয়ান সমস্ত অস্পষ্টতা দূর করে আইনের পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেন তিনখানি গ্রন্থে; যথা—কোড্, ডাইজেস্ট এবং ইনস্টিটিউট।

নতুন আইনে খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়। গির্জার উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। নাগরিকদের নানা অধিকার দেওয়া হয়। আর দেশের মানুষকে বিশিষ্ট ও সাধারণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। জাস্টিনিয়ান এই কাজ করেছিলেন বলেই আমরা প্রাচীন রোমান আইন-কানুনের এক ধারাবাহিক বিবরণ পাই। এ কারণেই তাঁকে 'সভ্য সমাজের আইন প্রণেতা' বলে অভিহিত করা হয়।

॥ জাস্টিনিয়ানের শিল্প ও স্থাপত্য ॥

জাস্টিনিয়ান নানাপ্রকার অট্টালিকা নির্মাণে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে অকাতরে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও গির্জা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব হল, রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে সেন্ট সোফিয়া গির্জার সংস্কার সাধন এবং পুনর্নির্মাণ। গির্জাটি এখনো যে-কোন দর্শককে বিস্মিত করে।

আড়ম্বরপ্রিয়তা

রাজদরবারে জাঁকজমকও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

॥ বাইজেন্টাইন সভ্যতার পরিচয় ॥

পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিল দীর্ঘকাল স্থায়ী। এই সাম্রাজ্যের বড় বড় শহরগুলো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদেই ব্যবসায়িগণ দূর দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়। এই পরিচয় নিজ নিজ দেশের শিক্ষা-

শিল্পচিন্তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছিল বাইজেন্টাইন সভ্যতার। নানা বিদেশীর যাতায়াত ছিল এই সভ্যতার নানা বাণিজ্যকেন্দ্রে। ভাবের আদান-প্রদানের এটাই ছিল সহজতম পথ। যাই হোক, রেশমজাত বিভিন্ন উপকরণ ও খাদ্যশস্য ছিল ব্যবসার প্রধান বস্তু।

ব্যবসা-বাণিজ্য

বাইজেন্টাইন লোকেরাও ছিল বেশ শিক্ষিত। ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতো, গ্রীক পণ্ডিতদের নানা রচনার সঙ্গে পরিচিত হত। সম্রাটরাও পণ্ডিতদের সমাদর করতেন। অভিজাতরাও নিজেদের উন্নত সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করতো।

শিক্ষা

এই সভ্যতার সাহিত্য বলতে প্রধানতঃ ধর্মীয় পুস্তকই বোঝায়। এই সব পুস্তকে যাজকদের অলৌকিক নানা কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহিত্য

স্থাপত্য শিল্পে বাইজেন্টাইন সভ্যতার উন্নতি বিশেষ চমকপ্রদ। রাজধানী কনস্টান্টিনোপল ছাড়া অন্যান্য শহরগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল আড়ম্বরপূর্ণভাবে। রাজদরবারের সাজসজ্জাও ছিল অপূর্ব। বহুমূল্য বস্ত্রাদি, নানাবিধ দর্শনীয় দ্রব্য, খেলনা, যন্ত্রচালিত ঘড়ি ইত্যাদি দিয়ে দরবার ছিল সুসজ্জিত। দরবারের উঠোনে সোনার গাছে মণিমুক্তার ফুল ঝলমল করতো, গাছে থাকতো সোনার পাখী। সোনার তৈরী সিংহও ছিল কয়েকটি।

স্থাপত্য শিল্প

স্থাপত্য শিল্পে বাইজেন্টাইন সভ্যতার বিশেষ অবদান হল মোজাইক পদ্ধতির প্রয়োগ। মোজাইক হল নানা রংয়ের পাথর ও কাচ দিয়ে কারুকার্য করা এক স্থাপত্যরীতি। এই যুগে মোজাইকের নানা দেবদেবী ও সাধু-সন্তদের মূর্তি নির্মিত হয়।

এই সময়ে স্থাপত্য শিল্পের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হল সেন্ট সোফিয়ার গির্জা। রাজধানীতে এই গির্জা নির্মিত হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে। দশ হাজার লোক পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করে এই গির্জা নির্মাণ সম্পূর্ণ

করে। গির্জার মাঝখানে এক বর্গক্ষেত্রাকার কক্ষের ওপরে আছে এক বিরাট গম্বুজ যার উচ্চতা হল ৫০ মিটার। সেই সময় এমন বিশাল অট্টালিকা কিভাবে যে নির্মাণ করা হয়েছিল তা কল্পনাই করা যায় না।



সেণ্ট সোফিয়া গির্জা

গির্জার ভেতরে কারুকার্য ছিল আরো অনবদ্য। দেওয়ালের গায়ে সোনা-রূপা দিয়ে ছিল নানা শিল্পকার্য। মাঝে মাঝে সিল্কের কাপড়ের উপর সুন্দর সুন্দর নক্সা। আর রয়েছে অপূর্ব সব চিত্রশিল্পের তুলনাহীন নজির।

ইউরোপীয় সভ্যতার জ্ঞান-ভাণ্ডারে বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই গ্রীক সভ্যতার সময় থেকেই এখানে জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। পরবর্তীকালে আরবদের সহায়তায় তা আরও ঐশ্বর্যশালী হয়ে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে যায়।

ধর্মীয় বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে এই সময়কার পণ্ডিতগণ বিশেষ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতেন। আবার এ সময়কার

ঐতিহাসিকগণ তাঁদের সময়কার ঘটনাবলী সযত্নে লিপিবদ্ধ করে তাঁদের কথা জানতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছেন। যেমন জাস্টিনিয়ানের শাসনকালের কথা জানা যায় ঐতিহাসিক প্রকোপিয়াসের রচনা থেকে বিভিন্ন গ্রীক সাহিত্যের বহু অনুবাদ করা হয়েছিল এবং এইসব অনুবাদ বেশ জনপ্রিয়ও ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ সময়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। শত্রুর জাহাজে আগুন লাগাবার জন্য 'গ্রীক ফায়ার' নামে একরকম আগুনের গোলার ব্যবহার তাঁদের বৈজ্ঞানিক দক্ষতার পরিচয় দেয়। এই গোলা এক ধরনের নলের ভেতর দিয়ে শত্রুর জাহাজে নিক্ষেপ করা হত।

জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক অবদান হল বাইজেণ্টাইন সভ্যতা। এই সভ্যতার বিকাশে কন্‌সটানটাইন ও জাস্টিনিয়ান দুটি উল্লেখযোগ্য নাম। কন্‌সটানটাইন তাঁর সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। আর জাস্টিনিয়ান সেই সময়কার আইন-কানুন নথিভুক্ত করে এক সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁদের কৃতিত্বে রাজধানী কনস্টানটিনোপল এক দ্বিতীয় রোমে পরিণত হয়েছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। কন্‌সটানটাইন কোথায় তাঁর রাজধানী নির্মাণ করেন? ঐ স্থান তিনি নির্বাচন করেন কেন? রাজধানী সুরক্ষার জন্য তিনি কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

২। কন্‌সটানটাইন খ্রীষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন কেন? খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার ফল কি হয়েছিল?

৩। জাস্টিনিয়ানকে সভ্য সমাজের আইন প্রণেতা বলে অভিহিত করা হয় কেন ?

৪। স্থাপত্য শিল্পে বাইজেন্টাইন সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান কি ? বাইজেন্টাইন দরবারের জাঁকজমকের এক বিবরণ দাও।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। কন্সটানটাইন কি রকম সম্রাট ছিলেন ? তাঁর চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় এমন কোন ঘটনার উল্লেখ কর।

২। কোন্ দেশের সঙ্গে জাস্টিনিয়ানের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছিল ? সেই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?

৩। জাস্টিনিয়ানের আইন বিষয়ক গ্রন্থ তিনটি কি কি ? তিনি কোন্ কোন্ নতুন আইন করেন ?

৪। বাইজেন্টাইন সভ্যতা বলতে কি বোঝায় ? এই সাহিত্যে কি. বর্ণনা করা হয়েছে ?

৫। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

বেলাসেরিয়াস, সেন্ট সোফিয়া, থিওডোরা, মোজাইক।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নীচের 'ক' স্তম্ভের বক্তব্যের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের দেওয়া নামগুলো মেলাও :—

॥ ক ॥ স্তম্ভ	॥ খ ॥ স্তম্ভ
(অ) নিরক্ষর ও নিঃসন্তান রাজা ছিলেন	(অ) থিওডোরা।
(আ) এই রানী সম্রাটকে দীর্ঘকাল দেশ শাসনে সাহায্য করেছিলেন	(আ) জাস্টিন।
(ই) জাস্টিনিয়ানের সামরিক সাফল্যের মূল কৃতিত্ব হল তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি	(ই) মোজাইক।
(ঈ) বাইজেন্টাইন সভ্যতার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই আগুনের গোলা ব্যবহারে	(ঈ) বেলাসেরিয়াস।
(উ) বাইজেন্টাইন সভ্যতা স্থাপত্য শিল্পে এক নতুন রীতি প্রচলন করে	(উ) গ্রীক ফায়ার।

২। নীচের কথাগুলোর বাকী অংশ প্রত্যেক বাক্যের পাশে বন্ধনীর ভেতর দেওয়া আছে। সঠিক অংশটি খুঁজে বের কর :—

(ক) সেণ্ট সোফিয়া গির্জাটি নির্মিত হয়েছিল (চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম শতাব্দীতে।

(খ) কন্‌সটানটাইন প্রথমে ছিলেন (সেনাপতি, রাজপুত্র, অভিজাত)।

(গ) কনস্টাণ্টিনোপলের সুরক্ষার ফলে নগরের ভেতরে ঢুকতে পারেনি (গথরা, হুনরা, পারসিকরা)।

(ঘ) কন্‌সটানটাইনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পিছনে ছিল (ধর্মের ভয়, ক্ষমতার লোভ, গরীবের মঙ্গল)।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। জাস্টিনিয়ানের ইতিহাস লিখেছিলেন কে ?

২। প্রাচীনকালে বাইজেণ্টাইন কি ছিল ?

৩। কনস্টাণ্টিনোপল তৈরী করতে কতদিন লেগেছিল ?

৪। থিওডোরা কি ধরনের রানী ছিলেন ?

৫। জাস্টিনিয়ানের উল্লেখযোগ্য গুণগুলো কি কি ?

৬। ব্যবসা-বাণিজ্যের কি প্রভাব পড়েছিল বাইজেণ্টাইনের ওপর ?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। একটি মানচিত্র এঁকে তাতে জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্যের সীমানা নির্দেশ কর।

২। একটি বিতর্ক সভার আয়োজন কর। বিতর্কের বিষয় হবে : "সভার মতে জাস্টিনিয়ান কন্‌সটানটাইনের তুলনায় অনেক যোগ্য শাসক ছিলেন।"

———

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

ইসলাম ও তার প্রভাব

বিষয়-সংকেত: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। আরব দেশে ইসলাম নামে এক ধর্মের প্রবর্তন হয়। এই ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ। তাঁর অনুগামীদের বলা হয় মুসলমান এবং মুসলমানরা একদিন পৃথিবীর বিরাট অংশে আধিপত্য করেছিল। আমরা এখন তাদের কথাই পড়ব।

॥ আরব : দেশ ও জাতি ॥

এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে লোহিত সাগরের তীরে আরব নামক দেশ—প্রকৃতপক্ষে এক বিশাল মরুভূমি। এই দেশের মরূদ্যানগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে-উঠেছে এক-একটি লোকালয়। মক্কা ও মদিনা হল এই এলাকার বিখ্যাত শহর।

ভৌগোলিক পরিবেশ

আরবের অধিবাসীরা ছিল বিখ্যাত সেমেটিক জাতের বংশধর। আরবীয়দের বলা হয় 'সেরাসিন'। এটি হল একটি আরবী শব্দ। অর্থ হল মরুর সন্তান।

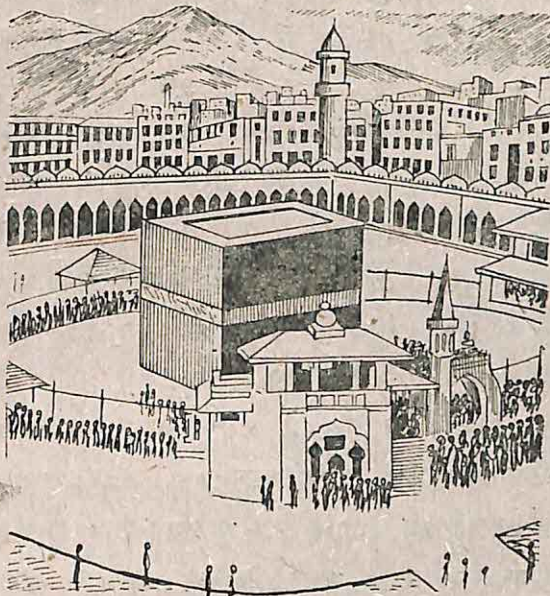
আরবীয়দের প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ লোক ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন-ধারণ করতো। আর এক ভাগকে বলা হয় বেদুইন। এরা যাযাবর ধরনের—কোন স্থানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে জানতো না। দলবদ্ধ হয়ে লুটতরাজ করে এরা জীবন-ধারণ করত।

অধিবাসীদের দুই ভাগ

আরবীয়দের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এদের বিভিন্ন ভাগের মধ্যে কোন রকম ঐক্য ছিল না। অধিবাসীরা নানা ধর্মে বিশ্বাসী ছিল—কেউ ছিল নানা দেব-দেবীর উপাসক, কেউ কেউ আবার খ্রীষ্টান ধর্মও গ্রহণ করেছিল। লোহিত সাগরের তীরে মক্কা শহরটি ছিল আরবীয়দের তীর্থক্ষেত্র। এখানে 'কাবা' নামে এক প্রস্তর খণ্ড আছে। তাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের

অনৈক্যের চিত্র

প্রতিনিধি আব্রাহামকে ঐ প্রস্তর খণ্ডটি দিয়েছিলেন। তাই তারা ওটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো।



কাবা মসজিদ

॥ হজরত মহম্মদ ও তাঁর শিক্ষা ॥

এমন যে আরব জাতি তারাই হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পরবর্তী একশ' বছরের মধ্যে এক বিরাট বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। আমাদের বিস্ময় লাগে, এই জাতির মধ্যে এমন বিরাট পরিবর্তন এল কি করে? এর উত্তর আমরা পাই, এদের ওপর ইসলাম ধর্মের অপরিসীম প্রভাব থেকে।

এই ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা ছিলেন হজরত মহম্মদ। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ হল আনুগত্য—অর্থাৎ ঈশ্বর বা আল্লার প্রতি অনুগত থাকা।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে হজরত মহম্মদ কোরেশ বংশে মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এই কোরেশ বংশই ছিল 'কাবা' মন্দিরের রক্ষক।

হজরত মহম্মদ ছিলেন খুবই গরীব, লেখাপড়া শেখার সুযোগও পান নি। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি খাদিজা নামে এক ধনী বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সংসারের প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি প্রায়ই মরুভূমি, পর্বত বা নির্জন স্থানে বসে ঈশ্বর চিন্তা করতেন। এভাবেই কেটে গেল দীর্ঘ পনের বৎসর। শেষ পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি একদিন আলোকের সন্ধান পেলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লা এক আর তিনি হলেন সেই আল্লার রসুল বা প্রেরিত পুরুষ। তাঁর এই উপলব্ধির কথা তিনি প্রথম প্রকাশ করেন তাঁর স্ত্রী ও আত্মীয় পরিজনের কাছে। পত্নী খাদিজা, পোষ্যপুত্র আলী, বন্ধু আবুবকর ও ভৃত্য জেইদ—এই চারজন প্রথম তাঁর শিষ্য হলেন।

জীবন ও সাধনা

এরপর তিনি প্রকাশ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু মক্কার অভিজাতগণ তাঁর প্রবল শত্রু হয়ে উঠলো। কারণ তাঁরা দেখলেন, মহম্মদের ধর্ম লোকে গ্রহণ করলে তারা আর কাবা মন্দিরে পূজা দিতে যাবে না, ফলে তাদের আয়ের পথ বন্ধ হবে। এদের শত্রুতা এতই বেড়ে গেল যে তিনি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় আসেন। এই বৎসর থেকেই মুসলমানেরা 'হিজিরা' সাল গণনা করে। আরবী ভাষায় হিজিরা শব্দের অর্থ হল অন্য স্থানে যাওয়া। মদিনার অধিবাসীগণ শীঘ্রই হজরত মহম্মদের ধর্মমত মেনে নিল।

মদিনায় আগমন

কিন্তু হজরত মহম্মদ যে মক্কা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তা তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই তিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধকে বলা হয় ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ। শেষ পর্যন্ত হজরত মহম্মদ জয়লাভ করেন এবং মক্কাবাসীগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। বিদেশেও তাঁর মত প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি দূত

আরব জুড়ে প্রাধান্য লাভ

প্রেরণ করেন। মক্কা জয়ের তিন বৎসর পরে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বাষট্টি বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

॥ ইসলাম ধর্মমত ॥

কোরাণ

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হলেন হজরত মহম্মদ। এই ধর্মের অনুরাগীদের বলা হয় মুসলমান অর্থাৎ যারা ঈশ্বরে অনুগত। এই ধর্মের মূলকথা 'কোরাণ' নামক পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

ইসলামে কোন জাতিভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ নেই। সব মুসলমানই পরস্পরের কাছে ভাইয়ের মত। এই বক্তব্যই আরব-জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

অবশ্য কর্তব্য

কোরাণ-এ মুসলমানদের জন্য কয়েকটি অবশ্যকরণীয় কর্তব্য আছে। প্রথম—তারা মেনে নেবে ভগবান এক এবং হজরত মহম্মদ হলেন, ভগবান প্রেরিত পুরুষ। অন্য কোন দেবতা বা মূর্তির স্থান এই ধর্মে নেই। দ্বিতীয়—দিন-রাত্রি মিলে প্রত্যহ পাঁচবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যাকে বলে নামাজ। তৃতীয়—দরিদ্রকে ভিক্ষা দিতে হবে এবং আয়ের এক পঞ্চমাংশ দান করতে হবে। চতুর্থ—রমজান মাসে উপবাস বা রোজা পালন করতে হবে। পঞ্চম—যাদের সামর্থ আছে তাদের অন্ততঃ জীবনে একবার মক্কায় তীর্থযাত্রা করতে হবে। তাছাড়া তাদের অতিথি সেবা করতে হবে এবং তাদের মদ্য পান করা ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ।

॥ ইসলাম ধর্মমত প্রসারের হেতু ॥

ধর্মের বিস্তার

প্রকৃতপক্ষে মহম্মদের ইসলাম ধর্ম সারা পৃথিবীতে চমক সৃষ্টি করেছিল। এই ধর্ম যে শুধু আরবীয়দের ঐক্যবদ্ধ করেছিল তাই নয়, তাদের এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে। তাদের চেষ্টাতেই এই ধর্ম সিরিয়া, মিশর ছাড়িয়ে

পূর্বদিকে সিন্ধুদেশ এবং পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কেবল ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে আরবীয়গণ পরাজিত হওয়ায় ইউরোপে ইসলাম ধর্ম প্রসারলাভ করতে পারে নি।

বিস্তারের কারণ

তা হলেও ইসলাম ধর্মের এই বিস্তৃতি নি:সন্দেহে বিস্ময়কর। তার কয়েকটি কারণও আছে। প্রথমেই বলতে হয়, ইসমাম ধর্মই আরব জাতিকে এমন শক্তিশালী করে তোলে যে তারা অন্যত্রও এই ধর্ম বিস্তারে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া বাইজেন্টাইন সম্রাটেরা অ-খ্রীষ্টান প্রজাদের উপর অত্যাচার করতেন। এইসব লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে চাইলো। আরবীয় সেনাদলও খুবই কষ্টসহিষ্ণু এবং সুশৃংখল। তারা জানতো, যুদ্ধে জয়লাভই তাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। তাই তারা মরণপন লড়তো। আবার বিভিন্ন দেশে ধন-রত্ন লুটপাটের আশাতেও বহুলোক ইসলাম সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। এ সময় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেরও শেষ অবস্থা। এই সাম্রাজ্যেরও আরবীয়দের প্রতিহত করার মত শক্তি ছিল না। আয়বীয়দেরও নিজ দেশের দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়ই ছিল নতুন দেশ জয় করা। এই সব কারণ মিলিয়েই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দূর্বার গতিতে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে।

॥ খলিফা শাসন প্রবর্তক ॥

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর চার প্রধান শিষ্যকে খলিফা বা মহম্মদের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করা হয়।

আবুবকর

প্রথম খলিফা হলেন হজরত মহম্মদের প্রিয় শিষ্য ও দীর্ঘকালের সুখ-দুঃখের সঙ্গী আবুবকর। ইনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশজয়ে বের হন। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে প্রায় বিনা বাধায় দখল করেন সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও আফ্রিকার রাজ্যগুলো।

এরপর তিনি পারস্য জয় করে চীনদেশে উপস্থিত হলেন। এখানেই মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ জাতি তাতারগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এর পরই আবুবকরের মৃত্যু হয়। ইনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন-যাপন করতেন এবং কঠোরভাবে ধর্মীয় নির্দেশ মেনে চলতেন।

পরবর্তী খলিফা হলেন ওমর। ইনি খুবই ধার্মিক, সরল ও নম্র ছিলেন। তিনি প্রকৃতই ফকির বাদশা।

ওমরের পর খলিফা হন ওসমান। ইনি কিন্তু ভোগবিলাসে বিশেষ আসক্ত ছিলেন। কিছু লোক মনে করতো হজরত মহম্মদের পর আলী ছিলেন প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কেন-না আলী ছিলেন মহম্মদের পোষ্যপুত্র এবং জামাতা। এখন ওসমানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখে আলীর সমর্থকেরা ওসমানকে হত্যা করে এবং আলীকে খলিফা বলে ঘোষণা করে।

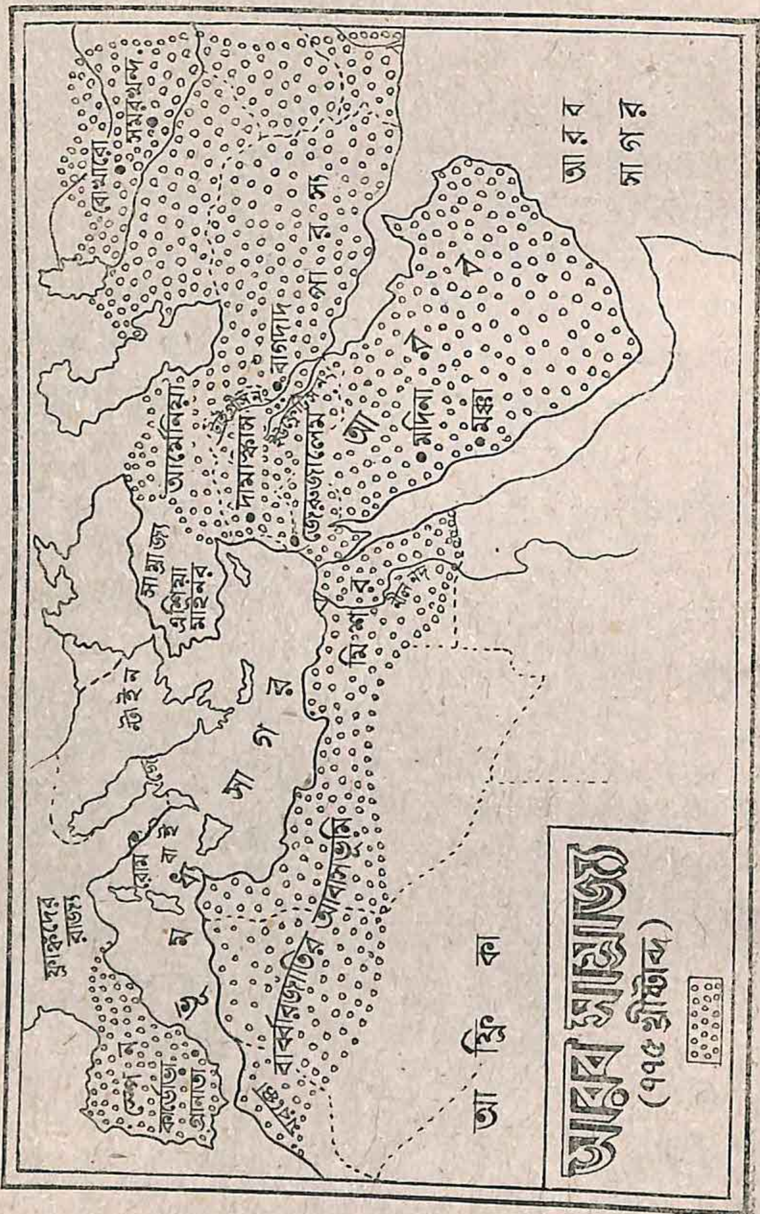
ওসমান

কিন্তু আলী খলিফা হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সিরিয়ার শাসনকর্তা মাবিয়া আলীর বিরোধিতা করেন। ফলে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মাবিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। আলী সন্ধি করেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে কুফা নগরীতে তিনি নিহত হন। এইবার মাবিয়া নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।

মাবিয়া ও উমাইয়া বংশ

মাবিয়া খলিফা এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ উমাইয়া বংশ নামে পরিচিত। এই বংশ প্রায় একশ' বৎসর শাসন করেছিল। এদের রাজধানী ছিল দামাস্কাস। এই বংশে খলিফাপদ ছিল বংশানুক্রমিক। তাই উত্তরাধিকার নিয়ে বিপদ ঘটতো না।

অন্যদিকে ইরাকের মুসলমানেরা মাবিয়াকে খলিফা বলে মেনে নিল না। তারা আলীর পুত্র হাসানকে খলিফা বলে ঘোষণা করলো। কিন্তু হাসান মাবিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং মক্কায় বসবাস করতে থাকেন।


আরব সাম্রাজ্য
(৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)
আরব সাগর
মক্কা
মদিনা
বাগদাদ
দামাস্কাস
জেরুজালেম
বোখারা
সমরখন্দ
আর্মেনিয়া
মিশর
আফ্রিকা
ফ্রাঙ্কদের রাজ্য
বার্বারজাতির আবাসভূমি

মাবিয়ার মৃত্যুর পর খলিফা হলেন তাঁর পুত্র এজিদ। আবার নতুন করে ক্ষমতার লড়াই শুরু হল। কুফার মুসলমানগণ আলীর দ্বিতীয় পুত্র হোসেনকে খলিফা হবার আমন্ত্রণ জানালো। হোসেন সত্তর জন অনুচর নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু কুফার পঁচিশ মাইল উত্তরে কারবালা নামক স্থানে এজিদের সৈন্যবাহিনী হোসেনের মুখোমুখি হল। তখন মহরম মাস। এই মাসের দশম দিবসে হোসেন সকল অনুচরসহ ধ্বংস হয়ে গেলেন। এই শোচনীয় ঘটনার স্মরণেই মুসলমানেরা মহরম অনুষ্ঠান করে থাকে। এই ঘটনা থেকেই মুসলমানেরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক ভাগ শিয়া নামে পরিচিত—এরা আলী ও তাঁর পুত্রদেরই আইনসংগত খলিফা মনে করেন। অন্যভাগ হল সুন্নী, এরা মাবিয়ার সমর্থক।

কারবালার ঘটনা

এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ লেগেই থাকতো। শেষ পর্যন্ত অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উমাইয়া বংশের শেষ খলিফাকে মিশরে হত্যা করে আলীর অনুগামীরা ক্ষমতা দখল করে। নতুন খলিফা হলেন আবুল আব্বাস। আরম্ভ হল আব্বাস বংশের শাসন। আব্বাস বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা হলেন হারুণ-অল-রসিদ।

আব্বাস বংশ

হারুণ পৃথিবীর ইতিহাসেও একজন বিখ্যাত দেশ শাসক। তাঁর শাসনকাল ছিল তেইশ বৎসর। এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাগদাদকে ঐশ্বর্য-আড়ম্বর, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। শহরের সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। পৃথিবীর নানাদেশ থেকে নানা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি এখানে সমবেত হতেন জ্ঞানার্জনের আশায়। পৃথিবীর আর কোন রাজার দরবারে এত পণ্ডিতদের সমাবেশ হয় নি, যা হয়েছিল হারুণের সভায়। তিনি

হারুণ ও বাগদাদ

নিজেও ছিলেন কবি, পণ্ডিত ও বাগ্মী। নানাদেশের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

খলিফা আল-মামুদ বাগদাদে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ছিল বিরাট গ্রন্থাগার, শাস্ত্র আলোচনার এবং অনুবাদের ব্যবস্থা। অনুবাদকের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন হুনায়ন ইবন বসাক। ইনি প্লেটো, আরিস্টটল, গ্যালেন প্রভৃতি পণ্ডিতদের গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদক ছাড়া তিনি ছিলেন চিকিৎসকও।

বাগদাদের পণ্ডিতগণ

॥ কর্ডোভার পরিচয় ॥

উমাইয়া বংশের আবদল্ রহমান নামে এক যুবক দামাস্কাস থেকে পালিয়ে স্পেনে আসেন। সৈন্যবাহিনীর এক অংশও তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। ধীরে ধীরে তিনি খলিফার হাত থেকে স্পেন মুক্ত করে আমীর উপাধি নিয়ে স্পেন্ শাসন করতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে ফ্রাংক সম্রাট শার্লামেনের যুদ্ধ হয়েছিল।

আবদল্ রহমানের রাজধানী ছিল কর্ডোভা শহরে। এই শহরের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের সঙ্গে কেবল কনস্টান্টিনোপল বা বাগদাদেরই তুলনা চলে। বিভিন্ন বিদেশী রাজ্যের দূতগণ এখানে বাস করতো। শহরে ছিল সাতশ' মসজিদ আর তিনশ' স্নানাগার। 'আল্হামরা' রাজপ্রাসাদে ছিল চারশ' কক্ষ। অসংখ্য দাসদাসী ও রক্ষী রাজপ্রাসাদের শান্তি-শৃঙ্খলা দেখাশুনা করতো। প্রশস্ত রাজপথ, ঝরণা আর আলোয় উজ্জ্বল, নাগরিক জীবনের যাবতীয় সুবিধে ছিল সহজলভ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে হয়েছিল প্রভূত উন্নতি।

॥ আরবদের অবদান ॥

বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আরবদের দানের তুলনা নেই। এই যাযাবর জাতির নিজস্ব কোন শিক্ষা-সংস্কৃতি না থাকলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে মাত্র দুশ' বছরের মধ্যে তারা

এক সভ্য, শিক্ষিত ও চিন্তাশীল জাতিতে পরিণত হয়েছিল। যে গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান এতকাল ছিল অবহেলিত, আরবদের হাতে তা নতুন করে জন্মলাভ করে। অংক শাস্ত্রে যে সংখ্যা আজ ইউরোপ ব্যবহার করে তা আরবদের দান। শূন্য সংখ্যা দ্বারা গণনা শুরু করা আরবদেরই শিক্ষা। বীজগণিতের আবিষ্কারও আরবীয়দেরই। রাসায়নিক দ্রব্য যন্ত্রপাতি দ্বারা পরীক্ষা করার পদ্ধতি আরবীয়রাই আমাদের শিখিয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও তাদের দানের সীমা নেই। বহু রোগের লক্ষণ তারা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিল। নানা দেশ ঘুরে ঘুরে বহু দেশের মানচিত্র তারাই প্রথম তৈরী করেছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

ভারত থেকে আরব শিখেছিল সাহিত্য, গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র। বিভিন্ন সংখ্যা ও দশমিক গণনা রীতি আরবীয়গণ ভারতীয়দের কাছ থেকেই শিখেছিল। আবার চীনদেশ থেকে কাগজ তৈরী করার পদ্ধতি জেনে নিয়ে আরব তা ইউরোপে প্রবর্তন করেছিল।

গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে এক সময় আরব পণ্ডিতরা ইউরোপের গুরুর স্থান অধিকার করেছিলেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিকরা আজও আভেসিনা ও আভারোসের কথা ভোলেন নি। আভেসিনার আসল নাম আবু আলি আল্ হুসেন ইকাসিনা। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন তা বহুদিন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল। দর্শন শাস্ত্রেও তাঁর দান অমূল্য। আভারোস-এর প্রকৃত নাম ইবন। তিনিও দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্র লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আল্-বিরুণী ছিলেন গণিতের পণ্ডিত। তিনি সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। তিনি সংস্কৃত শিখে এদেশের দর্শন ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। ইবনবতুতা ছিলেন একজন ভারত পর্যটক। তিনি মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে বহুদিন এদেশে থেকে একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণী লিখে গিয়েছেন। ইবন খালদুনও একজন ঐতিহাসিক ও সমাজ-

কয়েকজন পণ্ডিত

তত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনায় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নির্দেশ করে গিয়েছেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আরবীয়রা অসাধারণ কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা প্রচুর আঙ্গুর, যব, গম, ইক্ষু উৎপাদন করতো। ভারত থেকে আমদানী করতো তুলা, চাল, কমলালেবু প্রভৃতি। তাদের তৈরি রেশম জাতীয় পোষাক, কাচের তৈরী জিনিসপত্র ইত্যাদি সমগ্র ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

ইসলাম ধর্মের প্রভাব

আজ গোটা আরব দুনিয়ায় ইসলাম ধর্মের প্রবল প্রভাব। ইসলাম ধর্মই এই অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারে আজকের পৃথিবীতে আরব-অঞ্চলকে অস্বীকার করার কোন উপাই নেই। ইউরোপীয়দের জীবনধারাতেও ইসলামের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। তাদের তালিকায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, স্থাপত্য শিল্পে, খেলাধুলা, গান-বাজনায় ইসলামের প্রভাব দেখা যায়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দূর্বার গতিতে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

হজরত মহম্মদের ইসলাম ধর্ম সমগ্র আরব জগতকে ঐক্যবদ্ধ করে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করে। আরবীয়দের উদ্যোগে পৃথিবীর একটা বিরাট অংশে ইসলাম ধর্ম প্রসারিত হয়। অবশ্যই এই প্রসার সম্ভব হয়েছিল বাহুবলে। নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের ক্ষেত্রে আরবীয়গণ এক গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। আরবীয়গণ কোন্ জাতির বংশধর? সেই জাতি বিখ্যাত কেন? আরবীয়গণ কেন ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারেন নি?

২। ইসলাম শব্দের অর্থ কি? এই ধর্মের প্রবর্তক কে? এই ধর্মের মূলকথা কি কি?

৩। আব্বাস বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা কে ছিলেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল? তাঁর রাজধানী বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল কেন?

৪। উমাইয়া বংশের কোন্ যুবক দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন? তারপর তিনি কি করেন? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল? তাঁর রাজধানীর বর্ণনা দাও।

৫। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আরবের দান অপরিসীম? এই অবদানের মধ্যে যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয় সেগুলো উল্লেখ কর।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। ইয়াথ্রিব মদিনা হল কেন?

২। মদিনাবাসী মহম্মদের শিষ্য হল কেন?

৩। মুসলমানদের অবশ্যকরণীয় পাঁচটি কর্তব্য কি কি?

৪। কোরাণ রচিত হয় কিভাবে?

৫। মুসলমানদের মধ্যে দুই গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় কেন?

৬। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
কারবালা, আবুবকর, হিজিরা, জেহাদ, খলিফা।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নীচে 'ক' স্তম্ভে দেওয়া নামগুলি 'খ' স্তম্ভে দেওয়া পরিচয়গুলোর সঙ্গে মেলাও :—

॥ ক ॥ স্তম্ভ	॥ খ ॥ স্তম্ভ
(অ) আলহামরা	(অ) কবি।
(আ) ফেরদৌসী	(আ) পর্যটক।
(ই) ইবন বতুতা	(ই) রাজপ্রাসাদ।

(ঈ) হুনায়ন ইবন বসাক — (ঈ) যুদ্ধক্ষেত্র।
(উ) কারবালা — (উ) মুসলমান সাল।
(ঊ) হিজিরা — (ঊ) অনুবাদক।

২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ক) মক্কা নগরের বিখ্যাত —— মন্দির।
খ) —— শব্দের অর্থ ঈশ্বরের অনুগত।
গ) মহম্মদের প্রিয় বন্ধু ও শিষ্য ছিলেন ——।
ঘ) মাবিয়া প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম —— বংশ।
ঙ) বাগদাদের বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ——।
চ) ফেরদৌসী রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম ——।
ছ) — সংখ্যার আবিষ্কারক আরবীয়গণ।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। কাবা কি?
২। বেদুইন কাদের বলে?
৩। হজরত মক্কা ত্যাগ করেন কেন?
৪। ইসলাম ধর্মের মূলকথা কোন্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে?
৫। সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে কে এসেছিলেন?
৬। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময় কোন্ পর্যটক এদেশে এসেছিলেন?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। এর আগে তোমরা বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও খ্রীষ্টান ধর্মের কথা পড়েছ। আজ পড়লে ইসলাম ধর্মের কথা। এইবার তোমরা একটি আলোচনা সভার আয়োজন কর। আয়োজন সভার বিষয়বস্তু হবে, "সব ধর্মেরই মূলকথা মানুষকে ভালবাসা।"

———

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

বিষয়-সংকেত ঃ ধ্বংসপ্রায় পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য জুড়ে তখন এক গভীর হতাশা। নানা উপজাতির অবিরাম আক্রমণে গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে এক অস্থিরতা। এর মধ্যেও আবির্ভাব হয়েছে কোন দিগ্বিজয়ী বীরের, সুদক্ষ প্রশাসকের। এমনি এক বিখ্যাত সম্রাটের পরিচয় এবার আমরা পাবো।

যে সমস্ত জার্মান উপজাতি বারবার আক্রমণ করে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তাদের মধ্যে ফ্রাংক উপজাতি এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই উপজাতির শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন **শার্লামেন।**

॥ শার্লামেন বা মহাবীর চার্লস ॥

শার্লামেনের পিতামহ চার্লস মর্টেল সে সময় ফ্রাংক রাজার একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনিই দেশ শাসন করতেন। চার্লস মর্টেলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পেপিন পিতার পদ লাভ করেন।

প্রথম জীবন

পেপিন পোপের অনুমতি নিয়ে রাজবংশ উচ্ছেদ করে নিজেই রাজা হয়ে বসেন। পেপিনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ছেলে কার্লোম্যান ও চার্লসের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তিন বৎসর পরেই কার্লোম্যানের মৃত্যু হয়। তখন চার্লস সমগ্র রাজ্যের সম্রাট হয়ে বসেন। এই চার্লসই পরবর্তীকালে মহাবীর চার্লস বা শার্লামেন নামে পরিচিত হন।

শার্লামেনের জীবন-চরিত লেখক এইন্‌হার্ডের রচনা থেকে জানা যায়। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কৃতসংকল্প এবং লক্ষ্যে পৌঁছুতে বদ্ধপরিকর। মজবুত দেহে তাঁর ছিল অমিত শক্তি। তিনি ঘোড়ায় চড়তে এবং শিকার করতে খুব ভালবাসতেন। অসম্ভব পরিশ্রমীও ছিলেন তিনি।

শার্লামেনের স্বপ্ন ছিল খ্রীষ্টধর্মের পতাকাতলে ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করা। এই স্বপ্ন তিনি অনেকখানি সফল করে তুলতেও পেরেছিলেন।

তাই কেউ কেউ তাঁর সাম্রাজ্যকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য আখ্যা দিয়েছেন।



শার্লামেন

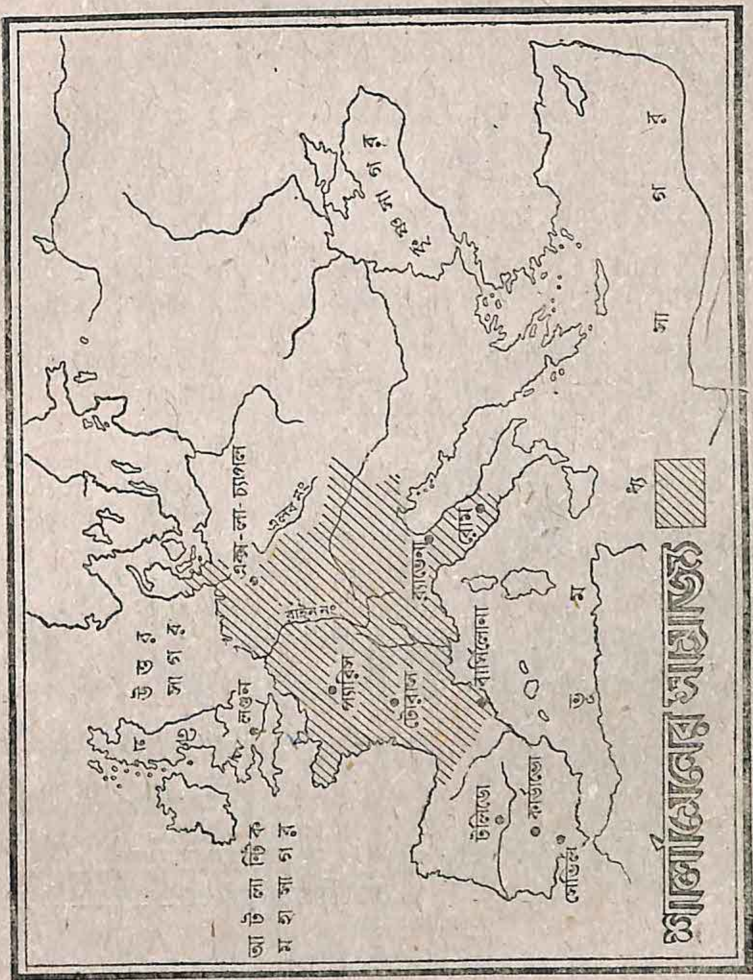
রাজ্যজয়

রাজা হয়েই তিনি রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁর তেতাল্লিশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি তিপ্পান্নবার যুদ্ধযাত্রা করেন। তাই তিনি জার্মানী, উত্তর স্পেন ও ইটালীর বেশীর ভাগ অংশই জয় করতে পেরেছিলেন।

রোল্যাণ্ড সংগীত

স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর সেনাপতি রোল্যাণ্ড এমন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন যে আজও সমগ্র ইউরোপ মনে রেখেছে। স্পেন জয় করে সৈন্য বাহিনীর ফেরার পথে এক পার্বত্য উপজাতির হঠাৎ আক্রমণের মুখে রোল্যাণ্ড বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। এই যুদ্ধের কাহিনী রোল্যাণ্ডের সংগীত নামক কাব্যে গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে আছে।

দুর্ধর্ষ স্যাক্সনদের দমন করবার জন্য শার্লামেনকে বার বার যুদ্ধ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের দমন করেন এবং তাদের খ্রীষ্ট-



ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। স্যাক্সনি প্রদেশে তিনি অনেক গির্জা তৈরী করেছিলেন। যাতায়াতের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

এই সময় বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী ছিলেন আইরিন। তিনিও শার্লামেনের প্রাধান্য মেনে নিয়েছিলেন। খলিফা হারুণ-অল

রশিদও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। হারুণ তাঁকে উপহার হিসেবে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন যীশুর সমাধির চাবি। এতে প্রমাণ হয় হারুণ শার্লামেনকে খ্রীষ্টান ও খ্রীস্টীয় সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন।

এই সময় রোমের অধিবাসীদের সঙ্গে পোপের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। একবার রোমবাসীদের অত্যাচার ও অপমানে পোপকে রোম ছেড়ে জার্মানীতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল এবং শার্লামেনের সাহায্য চাইতে হয়েছিল। শার্লামেনও অবিলম্বে রোমে এসে অপরাধকারীদের



শার্লামেনের রাজ্যাভিষেক

কঠোর শাস্তি দিলেন। কৃতজ্ঞ পোপও উপকারের প্রতিদান দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যীশুর জন্মদিনে সেই সুযোগ এসে গেল। শার্লামেন ঐদিন তখন সেন্ট পিটার গির্জায় উপাসনা করছিলেন। সেই সময়

হঠাৎ পোপ এগিয়ে এসে শার্লামেনের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিলেন এবং তাঁকে রোমের সম্রাটরূপে অভিনন্দন জানালেন। পোপের একাজের ফলে সাধারণ লোকও বিশ্বাস করলো যে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের উত্থান হল। এই জন্য তাঁর সাম্রাজ্য পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক নয়। কারণ শার্লামেনের রাজধানী রোম ছিল না, ছিল রাইন নদীর তীরে আচেন নগর। তিনি এই নগরকে নতুন রোম নাম দিয়েছিলেন।

অভিষেক

নিজে মূর্খ হলেও শার্লামেন খুবই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ল্যাটিন ভাষা ও ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি পড়তে জানতেন, কিন্তু লিখতে পারতেন না। ল্যাটিন ছাড়া গ্রীক ভাষাও তিনি জানতেন। ইউরোপের নানা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিকে তিনি রাজসভায় পরম সমাদর জানাতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত আলকুইন তাঁর সভায় আশ্রয় লাভ করেছিলেন।

চরিত্র

অস্বীকার করার উপায় নেই, ইউরোপের সেই অন্ধকারময় যুগে, যখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক ঘোর দুর্দিন, তখন একমাত্র শার্লামেন-ই সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

॥ মধ্যযুগের ধর্মীয় জীবন ॥

আমরা যে সময়ের কথা বলছি সে সময় ইউরোপের অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। তারা খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করত। যাজকদের ক্ষমতাও ছিল অসীম। দেশের জনসাধারণের জন্য যে আইন রচিত হত তা তাদের উপর খাটত না। যাজকরা কোন অপরাধ করলে তার বিচার হত পৃথক আদালতে। যাজকদের সম্পত্তির ওপর রাজকর ধার্যও হত না। এ সময় সাধারণ লোক ছিল নিরক্ষর আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের তুলনায় যাজকেরা ছিল অনেক বেশী শিক্ষিত। তাই তারা পরলোকের ভয়ে যাজকদের

নির্দেশ অন্ধবিশ্বাসে মেনে চলত। ফলে তখনকার সমাজজীবনে যাজকদের ছিল প্রচুর প্রভাব।

যাজকদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন রোমের বিশপ—তাঁকে বলা হত পোপ। পোপের ক্ষমতা ছিল অসীম। তাঁর প্রাসাদ এবং তাঁর চারদিকের কিছু জায়গাকে ভ্যাটিকান বলা হয়। ইউরোপের সমস্ত ধর্মযাজকেরা পোপের নির্দেশ মেনে চলত। এমন কি, পোপ ইচ্ছা করলে পশ্চিম ইউরোপের যে কোন দেশের রাজাকে বিধর্মী বলে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারতেন।

একদিকে যাজকেরা যেমন ছিল বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী তেমনই অপরদিকে জনসাধারণও তাদের কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হত। রোগীর চিকিৎসা এবং ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করত যাজকেরাই। সে সময় চার্চের পরিচালিত হাসপাতাল ছাড়া সরকারী হাসপাতাল ছিল না। গরীব লোকেরা ভিক্ষা পেত মঠবাসী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে। নিরাশ্রয়, আর্ত ও দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য যাজকদের দ্বার সব সময় উন্মুক্ত থাকত। আর সেই তমসাবৃত ইউরোপের জ্ঞানবর্তিকা জ্বালিয়ে রেখেছিল যাজকরা।

॥ মনাস্টারি ও খ্রীষ্টান সাধু ॥

এই যাজকরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—(১) **বিশপ**—এঁরা লক্ষ্য রাখতেন গৃহস্থেরা যেন ঠিকমত ধর্মাচরণ করে। (২) **মঙ্ক**—এঁরা তাঁদের মঠে বসে জপ-তপ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। মঙ্কদের আশ্রমকে বলা হত মনাস্টারি।

মঠের অধ্যক্ষকে বলা হত **অ্যাবট**। অ্যাবটরা যে সব কঠোর নিয়ম-কানুন প্রচলন করতেন মঠবাসী মঙ্কদের তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলতে হত। অনেক স্ত্রীলোকও মঙ্কদের ন্যায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতেন। তাঁদের বলা হত **নান** অর্থাৎ সন্ন্যাসিনী। নানদের থাকার জন্য পৃথক মঠের ব্যবস্থা ছিল। যেসব সন্ন্যাসী দেশে ঘুরে ঘুরে খ্রীষ্টধর্মের নীতি প্রচার করে বেড়াতেন তাঁদের বলা হত **ফ্রায়ার**। এই ফ্রায়ার

কেবল বক্তৃতা দিয়েই নিজের কর্তব্য সমাধা করতেন না, তাঁরা দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে জনসাধারণকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সেবাশুশ্রূষাও তাঁরা করতেন।

কিন্তু পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সেই চরম দুর্দিনে যখন জার্মান উপজাতির বারংবার আক্রমণ চলেছে, তখন ধর্মীয় জগতেও নেমে এসেছিল এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। একদিকে যেমন ধর্মীয় মঠগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি যোগ্যতাসম্পন্ন সত্যিকারের যাজক সম্প্রদায়েরও একান্ত অভাব দেখা গিয়েছিল। সমাজ জীবনে যে ক্ষমতা আর সুযোগ সুবিধে ভোগ করত তার লোভেই অনেক অযোগ্য ব্যক্তি যাজকদের পদ গ্রহণ করতে থাকে। ফলে যাজকদের নৈতিক মানেরও অবনতি ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়ে টুকরো টুকরো অনেক রাজ্যের সৃষ্টি হল। সেই রাজ্যগুলোতে নিজেদের স্বার্থে পৃথক পৃথক মঠও তৈরী হতে লাগল। সব মিলিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মীয় জগতে সে এক চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা।

এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার ইচ্ছায় কিছু কিছু ধর্মপ্রাণ যাজক আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করলেন। এরকমই একজন খ্যাতিমান ইটালীর যাজক হলেন সেণ্ট বেনেডিকৃট। তিনি মঠবাসী প্রত্যেক যাজকের জন্য অবশ্য পালনীয় কতকগুলো নিয়ম প্রণয়ন করলেন। তিনি বললেন, প্রকৃত যাজকের ধর্ম হল, বিবাহ না করা, দারিদ্র্য স্বীকার করে নেওয়া এবং মঠের প্রতি সর্বক্ষণ অনুগত থাকা। মঠাধ্যক্ষের সিদ্ধান্তকে চরম বলে প্রশ্নাতীত ভাবে মেনে নিতে হবে। প্রত্যেক মঠবাসী সন্ন্যাসীকে প্রত্যহ গির্জার সেবায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হবে, মঠের জমিতে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দৈহিক শ্রম করতে হবে এবং শাস্ত্রপাঠে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। তাদের খাদ্যাভ্যাস ও পরিচ্ছদ হবে খুবই সাধারণ এবং মঠে সম্মিলিত জীবনযাপন করতে হবে। আর কোন অবস্থাতেই তাদের মঠ ত্যাগ করা চলবে না।

বেনেডিকৃটের আইন

বেনেডিক্টের এইসব নিয়ম-কানুনের দ্বারা মঠজীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাই যে শুধু সহজ হল তাই নয়, সমাজ জীবনেও তার প্রভাব পড়ল। যেমন, সন্ন্যাসীদের মাঠে কাজ করা বাধ্যতামূলক হল; ফলে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে গেল। তাদের বিদ্যাচর্চার ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ সম্ভব হল।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই নিয়মগুলোর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হল না। কারণ মঠগুলোর নিজ নিজ এলাকায় প্রত্যেক মঠাধ্যক্ষ মঠের শৃঙ্খলা রক্ষায় নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী চলতেন। আবার বিভিন্ন মঠের ওপর কর্তৃত্ব করার মত ক্ষমতাও রোমের পোপের এ সময় ছিল না।

তাই সৎ যাজকেরা এই অবস্থার প্রতিকারের আশায় নানাভাবে



ক্লুনীর মঠ

চেষ্টা করে যেতে লাগল। এমনি সব চেষ্টায় জার্মানীর ক্লুনী মঠের

যাজকরাই অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এই মঠে জমিদান নিষিদ্ধ হল। আর মঠজীবনে অলসতা সর্বতোভাবে বর্জিত হল। তা ছাড়া এই মঠের অধীনস্থ অন্যান্য মঠগুলোর ওপর সতর্ক নজর রাখার ব্যবস্থা হল। অভিজাতগণের অর্থের বিনিময়ে বিশপদের পদ পাওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করা হল। যাজকদের অবিবাহিত থাকা বাধ্যতামূলক করা হল।

ক্লুনী মঠ

অল্পদিনের মধ্যেই ক্লুনী মঠে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো বিভিন্ন দেশের মঠগুলোতেও অনুসরণ করা হতে থাকে। রোমের পোপও এইসব ব্যবস্থাকে সমর্থন জানালেন।

ক্লুনী মঠের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল ধর্মীয় বিষয় থেকে অন্য সকল প্রভাবকে দূর করা একান্ত দরকার। তাই রোমের পোপ নির্বাচন যেন ধর্মীয় ব্যক্তিদের দ্বারাই হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হল। তাছাড়া বিভিন্ন দেশে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পোপের প্রভাব বৃদ্ধি করার মত উপযোগী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হল। এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশের রাজ-শক্তির সঙ্গে ধর্মীয় কর্তৃত্বের দূরত্ব বেড়ে যেতে লাগল। এই দূরত্ব অনেক সময় সংঘাতও সৃষ্টি করত। যেমন পোপ গ্রেগরীর সঙ্গে জার্মানীর সম্রাট চতুর্থ হেনরীর বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল বিশপদের নিয়োগ করা নিয়ে। গ্রেগরী বললেন, বিশপদের নিয়োগ করার অধিকার ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু হেনরী চিরাচরিত প্রথায় নিজেই বিশপ নিয়োগ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের এক আপোষ মীমাংসা করা হয়। এই বিরোধই ইতিহাসে "ইনভেস্টিচার বিরোধ" নামে পরিচিত। বিশপ নিয়োগের অধিকার যায় পোপের হাতে। এখন থেকে ধর্মীয় ব্যাপারের জন্য বিশপ দায়ী থাকলেন পোপের কাছে আর সরকারী কাজের জন্য সম্রাটের কাছে। যাইহোক এই বিরোধের ফলেই পোপের ক্ষমতা বেড়ে যায়।

ইনভেস্টিচার

মধ্যযুগে ইউরোপের জীবনে এই মঠগুলোর প্রভাব ছিল কিন্তু

অসাধারণ। যদিও প্রত্যক্ষভাবে মঠগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সন্ন্যাসীদের মোক্ষলাভে সাহায্য করা, তথাপি সৎ, সরল ও ধর্মীয় জীবন যাপনের ওপর এই মঠগুলোর যে গুরুত্ব তার প্রভাব পড়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনেও। শুধু তাই নয়, ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে মঠগুলোই ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এখানেই শিক্ষা পেয়েছে সে সময়কার মনীষিগণ। প্রত্যেকটি মঠের সঙ্গে গড়ে উঠেছে বিরাট গ্রন্থাগার। বিশেষ করে ইতিহাস রচনায় ও সংরক্ষণে এই মঠগুলোর অবদান তো কোন দিনই ভোলবার নয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনেও মঠগুলোর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। তারাই প্রথম তাদের জমিতে অভিনব উপায়ে কৃষি কাজের ব্যবস্থা করেছিল। অনাবাদী জমিকে কৃষিযোগ্য করে তুলেছিল। নানা ধরনের নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারে তারা প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল।

মঠের প্রভাব

॥ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ॥

মধ্যযুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রই ছিল ধর্মীয় মঠগুলো। মঠে বসবাসকারী সন্ন্যাসীর জন্য শিক্ষা ছিল অপরিহার্য। তাদের ধর্মীয় দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য ধর্মীয় গ্রন্থপাঠ করতেই হত। এভাবেই কালক্রমে মঠগুলো হয়ে দাঁড়ায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্র। ফলে দেখা গেল, প্রতি গির্জাতেই গড়ে উঠল বিদ্যালয় প্রধানতঃ সন্ন্যাসীদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই। কালক্রমে বাইরের সাধারণ লোকেরাও এইসব বিদ্যালয়েও পড়বার সুযোগ পেল। প্রথমে এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্য বিষয় ছিল, ব্যাকরণ, তর্কবিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র ইত্যাদি। তখনকার দিনে এইসব বিদ্যালয়ে আড়ম্বর ছিল না। ছাত্রদের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া যেত তাতেই মাহিনা দেওয়া হত। কখনও কখনও বিত্তবানেরা বিদ্যালয়ে অর্থদান করতেন।

মঠ বিদ্যালয়

তখন ছাপা বই ছিল না, হাতে লেখা পুঁথি নকল করতে হত। কাজেই বিদ্যালয়ে পাঠাগার ছিল না। অধ্যাপকদের বক্তৃতাই তাদের জ্ঞান সঞ্চয়ের পন্থা ছিল।

তারপর ক্রমশঃ এই বিদ্যালয়গুলোই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাজকদের অবদান কম নয়। মঠের বিদ্যালয়গুলোতে প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু আরব জগতের সঙ্গে পরিচয় হবার পর কেবল ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে মানুষের জ্ঞান-তৃষ্ণা দূর হল না। তারা চিকিৎসা বিজ্ঞান, আইন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ দেখাতে লাগল। এই প্রয়োজন মেটাতেই গড়ে উঠলো বিশ্ববিদ্যালয়। সার্লেন, বোলোনা, প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সাধারণতঃ চার ধরনের বিষয় পড়ানো হত। যথা, ধর্মশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র ও কলা-বিদ্যা। কলাবিদ্যা বলতে বোঝায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন। সার্লেন চিকিৎসা শাস্ত্রে, বোলোনা আইন শাস্ত্রে এবং প্যারিস ধর্মশাস্ত্রে খুব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠে ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্র পড়াবার ভাল ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বলা হত 'স্কুলম্যান' বা স্কলাসটিক্‌স। কারণ এঁরা বাইবেলের শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। পিটার এবিলার্ড, আলবার্ট ম্যাগনাস, টমাস এ্যাকুইনাস, রোজার বেকন ছিলেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ স্কুলম্যান। পিটার এবিলার্ড ছিলেন প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তিনি বলতেন বাইবেলের বাণীকেও আমাদের যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। তাই সেই মতবাদের জন্য তাঁকে প্যারিস থেকে পালাতে বাধ্য করেছিল। তিনি ট্রয়-য়ে গিয়ে এক নির্জন স্থানে আশ্রয় নেন।

স্কুলম্যানদের পরিচয়

কিন্তু সেখানেও তাঁর ছাত্ররা গিয়ে পৌঁছয়। পরে তিনি সেখানেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন। আলবার্ট ম্যাগনাসকে গ্রীক মহা-পণ্ডিত এ্যারিস্টটল ও টমাস এ্যাকুইনাসকে প্লেটোর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। রোজার বেকনকে বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। বারুদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করতে তিনি জানতেন। বাষ্পীয় শক্তি সম্পর্কেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।



টমাস এ্যাকুইনাস

এই সময়ই ইউরোপে নানা দেশীয় ভাষার বিকাশ ঘটেছিল। এতকাল পর্যন্ত ল্যাটিন ভাষাই ছিল শিক্ষার একমাত্র ভাষা। এখন নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশীয় ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। রচিত হতে লাগল দেশীয় ভাষায় নানা কাব্য। রবিন হুডের গল্প, শার্লামেনের সেনাপতি রোলাল্ডের বীরত্বের কাহিনী এই সময়েই রচিত হয়। ইংলণ্ডের আদি কবি চসার ইটালীর মহাকবি দান্তের আবির্ভাব হয় এই সময়েই। চসারের ক্যান্টারবেরী টেল্‌স ও দান্তের ডিভাইন কমেডি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

দেশীয় ভাষার বিকাশ

এ সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোন বয়সের লোকেরাই ছাত্র হিসেবে যোগ দিতে পারত। তবে তাদের ল্যাটিন ভাষা জানতে হত। কেন না তখন পড়ানো হত ঐ ভাষাতেই। শিক্ষকেরা যা

পড়াতেন তা নিয়ে আলোচনা হত কিংবা পাঠাগারে তা আরও ভাল করে পড়বার সুযোগ থাকতো। নানা দেশের ছাত্ররা নিজ নিজ দেশের ছাত্রদের নিয়ে আলাদা গোষ্ঠী তৈরী করতো। এই গোষ্ঠীগুলোকে বলা হত 'নেশন'। কখনো কখনো এই সব নেশনের মধ্যে ঝগড়াঝাটিও হত।

পড়াবার পদ্ধতি

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ছিল চমৎকার সম্পর্ক। ছাত্রদের আগ্রহের দরুন শিক্ষকরা কখনো ফাঁকি দিতে পারতেন না। ছাত্রদের কঠোরভাবে নিয়ম মেনে চলতে হত। নিয়ম ভাঙ্গলে ছাত্ররাই ছাত্রদের শাস্তি দিত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দেওয়াটাই ছিল যে কোন ছাত্রের পক্ষে সবচেয়ে বেশী অপমানকর।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

ফ্রাংক জাতির শ্রেষ্ঠ রাজা শার্লামেন কিছুদিনের জন্য ধ্বংসপ্রায় পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যকে এক নতুন গৌরবে উজ্জ্বল করে তোলেন। যেমন রাজ্য জয়ে, তেমন রাজ্য শাসনে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

এই সব ধর্মীয় জীবনে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নানা চেষ্টা হয়। যেমন বেনেডিক্টের আইন, ক্লুনী মঠের আইন ইত্যাদি। আবার ধর্মীয় মঠগুলোর চেষ্টাতেই এই সময়ের ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চলেছিল অবাধ গতিতে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই সময়েরই অবদান।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। শার্লামেনের আসল নাম কি? তিনি কিভাবে সিংহাসনে বসেন? তাঁর স্বপ্ন কি ছিল? তিনি কতটুকু তাঁর স্বপ্ন সফল করতে পেরেছিলেন?

২। শার্লামেনের অভিষেক হয় কখন? তাঁর এই অভিষেকের গুরুত্ব কি?

৩। ইউরোপে খ্রীষ্টান মঠ কেন গড়ে উঠেছিল? খ্রীষ্টান মঠের প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়? কেন বলা হয়?

৪। ইনভেস্টিচার বিরোধ কাকে বলে? এই বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল কেন? বিরোধের ফলাফল-ই বা কি হয়েছিল?

৫। মধ্যযুগে ইউরোপে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? এখানে কিভাবে পড়াশুনো হত? তখনকার ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। কাদের স্কুলম্যান বলা হয়? কেন বলা হয়?

২। রোল্যাণ্ড কে ছিলেন? তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন কেন?

৩। পিটার এবিলার্ড কে ছিলেন? তাঁর মত কি ছিল?

৪। কাকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়? তিনি কি কি জানতেন?

৫। ইংলণ্ডের আদি কবি কে? তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম কি?

৬। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঠের গুরুত্ব কি?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নীচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর :

(অ) ইংলণ্ডের কবি চসারের ডিভাইন কমেডি বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

(আ) তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হলে ছাত্রদের গ্রীক ভাষা জানতে হত।

(ই) আলবার্ট ম্যাগনাস ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

(ঈ) পোপ গ্রেগরীর সঙ্গে সম্রাট শার্লামেনের বিরোধই ইনভেস্টিচার বিরোধ।

২। 'ক' স্তম্ভের নামগুলোর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের পরিচয়গুলো মেলাও :

॥ক॥ স্তম্ভ	॥খ॥ স্তম্ভ
এইনহার্ড	পোপের প্রাসাদ।

॥ ক ॥ স্তম্ভ	॥ খ ॥ স্তম্ভ
রোল্যাণ্ড	বাইজেণ্টাইন সম্রাজ্ঞী।
আইরিন	সেনাপতি।
ভ্যাটিকান	জীবনী লেখক।
ফ্রায়ার	ধর্ম প্রচারক।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। ক্লুনী কি? এর গুরুত্ব কি?

২। এইনহার্ডের রচনা থেকে শার্লামেন সম্পর্কে কি জানা যায়?

৩। শার্লামেনের অভিষেক হয়েছিল কত খ্রীষ্টাব্দে? যে দিন তাঁর অভিষেক হয়েছিল সেদিনটি কি দিন ছিল?

৪। অ্যাবট কারা? তাঁদের কি করতে হয়?

৫। সেণ্ট বেনেডিক্ট কি কি আইনের কথা বলেছিলেন?

৬। মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কি কি বিষয় পড়ানো হত?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। একটি আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা কর। সেখানে আজকের পড়ানোর পদ্ধতি, মধ্যযুগের ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানোর পদ্ধতি এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।

২। শ্রেণীতে যে কোন একজন ছাত্র ভার নাও। বাড়ী থেকে কোনভাবে চসারের ক্যাণ্টারবেরী টেল্স-এর ঘটনাটি জেনে আসবে। তারপর সে ঘটনাটি শ্রেণীর সবাইকে বলবে।

———

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ

বিষয়-সংকেত ঃ রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে এক অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজ ব্যবস্থাতেও এসেছিল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনে সামন্ততন্ত্র প্রথার উদ্ভব হয়। দেশে ফিরে আসে এক সুস্থির অবস্থা যে অবস্থায় নীচুস্তরের জনসাধারণকে ভুগতে হয় চরম। তাদের শ্রমের বিনিময়ে এই সমাজ ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছিল। ইউরোপের সেই সমাজ ব্যবস্থাই এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

॥ (ক) সামন্ততন্ত্র প্রথা ॥

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে নেমে এল দুর্দিন। এই দুর্দিনের মধ্যে জন্ম নিল এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা, যার নাম ফিউড্যালিজম বা সামন্ততন্ত্র প্রথা। ইংরেজী ফিউড্যালিজম কথাটির অর্থ হল জায়গীর প্রথা। ফিউড্যাল শব্দটি এসেছে 'ফিউড' শব্দ থেকে। এর অর্থ হল—জমি ভোগ করার অধিকার। এই ব্যবস্থা অনুসারে জমির মালিক ও চাষীদের মধ্যে একটা চুক্তি থাকত। এই চুক্তি অনুসারে প্রজাকে মালিকের পক্ষে যুদ্ধ করতে হত কিংবা যুদ্ধের সময় সৈন্য যোগাতে হত। বিনিময়ে প্রজাকে দেওয়া হত চাষের জমি। অস্থির সমাজে মাৎস্যন্যায় অবস্থায় জনসাধারণ নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে এবং সুস্থ জীবন ব্যবস্থার আশায় এই প্রথা মেনে নেয়। মধ্যযুগে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল।

রোমের শাসনকালে ইউরোপে অনেক শহর ছিল। বর্বর উপজাতি ও হুনদের আক্রমণে সে সময় প্রায় সব শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাদের আক্রমণে বহু মানুষ ধনেপ্রাণে শেষ হয়ে গিয়েছিল। যারা বেঁচেছিল তারা শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিল। সে সময়ে দেশে কোন শাসন ছিল না। শহরের বড়লোকেরা গ্রামে গিয়ে যে যতটা পারল জমিজমা অধিকার করে ভোগদখল করতে লাগল। তারা

বিরাট ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে বিরাট ঘরবাড়ি বানিয়ে বসবাস করতে থাকল। এরকম জমিদারে দেশ ভরে গেল। ছোট, বড়, মাঝারি নানা শক্তির জমিদারের আবির্ভাব হল। তাদের মধ্যে ধনে-মানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি রাজা হলেন। এই রাজারা দস্যু বা বিদেশী আক্রমণে নিজেদের রক্ষা করতে পারলেও সাধারণ মানুষ আর কৃষকরা পড়ল দারুণ মুশকিলে। তাদের রক্ষা করবার কেউ রইল না। আক্রমণকারীরা এসে যখন-তখন তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করে নিত, তাদের প্রাণেও শেষ করত। এই অবস্থায় অন্য উপায় না দেখে সাধারণ মানুষ ও কৃষকরা তাদের কাছাকাছি শক্তিশালী কোন জমিদারের কাছে আশ্রয় নিত। জমিদারকে তারা মালিক বা প্রভু বলে স্বীকার করল। এতে জমিদারদের মান-মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল। আর প্রকৃত জমির মালিক সাধারণ মানুষ 'নিজভূমে পরবাসীর' মত নিজেদের জমিজমা প্রভু জমিদারকে দিয়ে নিজেরা প্রজা হয়ে প্রভু জমিদারের অধীনে রইল। এই প্রজারা জমিদারকে কর প্রদান ছাড়া জমিদারের নানা কাজ করে দিত।

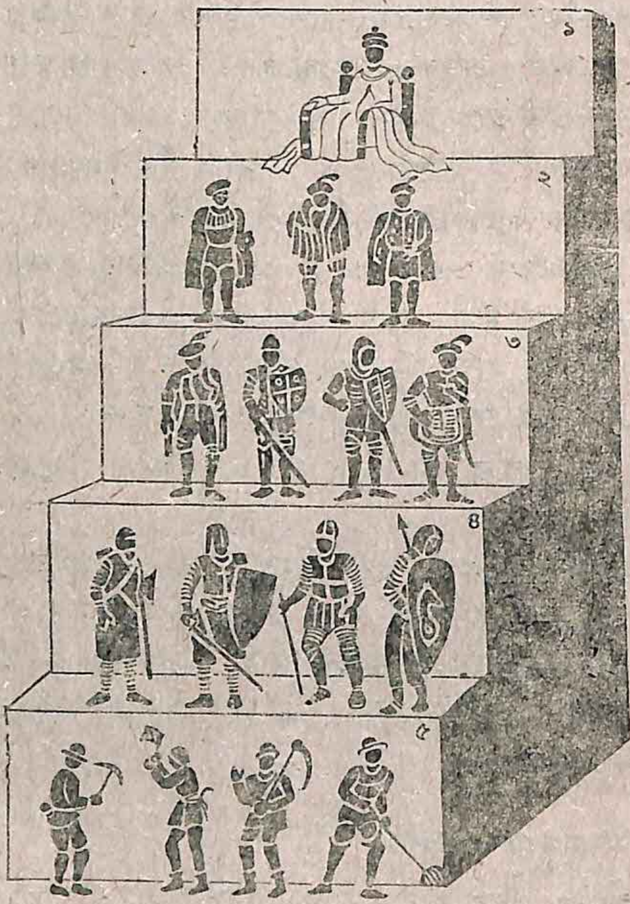
এই জমিদারী প্রথা ছিল অদ্ভুত রকমের। চাষীরা যেমন নিরাপত্তার জন্য গ্রামের জমিদারের আশ্রয় নিত, জমিদারও আবার তার চেয়ে বড় জমিদারের অধীনে থাকত। তিনি আবার তার চেয়ে আরও বড় জনের নীচে থাকতেন। এইভাবে থাকে—থাকে সাজান ছিল ফিউড্যাল পদ্ধতি।

॥ ফিউড্যাল প্রথার গঠন ॥

ফিউড্যাল প্রথার গঠন হয়েছিল শোষণ-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধের তাগিদে। বড়লোকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই প্রথার প্রবর্তন হয়। একটি দেশের রাজাই ছিলেন এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ স্থানে। তিনি জমির বন্দোবস্ত দিতেন ডিউক বা আর্লদের। এভাবে রাজা হতেন ডিউকদের 'সেইনোর' বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। এই ডিউক হলেন 'ভেসেল' বা

নিম্নস্তরের কর্তৃপক্ষ। ডিউকরা রাজার কাছ থেকে পেতেন প্রচুর গ্রাম ও জমিজমা। তাঁদের থাকত বিরাট সৈন্যবাহিনী।

ডিউকদের নীচে থাকতেন ব্যারণরা। ব্যারণদের ডিউকরা দিতেন কয়েকটি করে জমিসহ গ্রাম। ব্যারণরা একদল সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী



ফিউড্যাল প্রথার বিভাগ : ১। রাজা, ২। ডিউক অথবা আর্ল, ৩। ব্যারণস্, ৪। নাইটস্, ৫। চাষী জনসাধারণ (সার্ফ)।

রাখতেন। দরকার হলে ডিউকদের সাহায্য করত এই সৈন্যবাহিনী। এখানে 'সেইনোর' হলেন 'ডিউক' আর 'ভেসেল' হলেন 'ব্যারণ'।

ব্যারণরা জমি দিতেন 'লর্ড' বা 'নাইটদের'। এ অবস্থায় ব্যারণরা হলেন 'সেইনোর' এবং নাইটরা হলেন 'ভেসেল'।

নাইটদের নীচে ছিল কৃষক বা সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষ অর্থাৎ কৃষকরা গোটা ফিউড্যাল প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখত। জমি ছিল তখনকার দিনের একমাত্র সম্পদ। সেই সম্পদের দেখাশোনা, উৎপাদন করা, সবকিছু ভার ছিল সাধারণ মানুষের ওপর।

শুধু জমি দেখাশোনা বা উৎপাদন ব্যবস্থা করেই সাধারণ মানুষের কাজ শেষ হত না। এই ব্যবস্থাপনার মূল কথা ছিল সামরিক শক্তির যোগান নিশ্চিত করা। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে রাজা খবর দিতেন ডিউকদের, ডিউকরা বলতেন ব্যারণদের, ব্যারণরা তাগিদ দিতেন নাইটদের সৈন্য সরবরাহ করার জন্য। এইভাবে গড়ে উঠত ফিউড্যাল সামরিক শক্তি। এই সামরিক শক্তি ছিল পাঁচ মিশালী শক্তি। এসব সৈন্যদের ছিল না কোন যুক্তভাবে শিক্ষা আর তারই কারণে একক বীরত্ব প্রদর্শন ছাড়া যুক্তভাবে বিরাট কিছু করার শক্তি তাদের থাকত না।

এই প্রথায় জমির মালিকদের বলা হত লর্ড বা নোব্‌ল অর্থাৎ জমিদার। সাধারণ লোক জীবিকা অর্জন ও ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য জমিদারের ওপর ছিল নির্ভরশীল। তারা জমিদারের জমি-জমা চাষ-আবাদ করত, বাড়ীর চাষ-আবাদ ও নানাবিধ কাজকর্ম করত, আবার দরকার হলে যুদ্ধেও যেতে হত। প্রতিদানে জমিদাররা তাদের আহার-বাসস্থান দিতেন, জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

এই প্রথায় রাজার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। জমিদাররাই আপন আপন এলাকার মধ্যে সর্বময় প্রভু ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় শান্তিরক্ষা করতেন এবং প্রজাদের ওপর তাঁদের প্রভুত্ব কায়েম করতেন। তাঁদের কাজে কেউ বাধা দিতে পারত না। জমিদাররা প্রজাদের কর ধার্য করে দিতেন। প্রজাদের সমস্ত রকম মামলার বিচার করতেন। সে বিচার অন্যায় বিচার হলেও প্রজাদের নীরবে তা মাথা

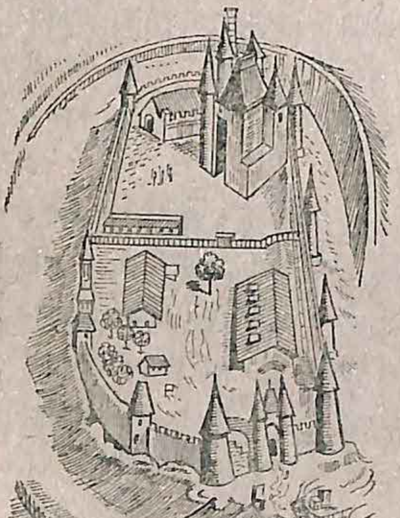
পেতে নিতে হত। সে বিচারের বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কারুর কাছে আর নালিশ করার উপায় ছিল না।

॥ ক্যাসল ও নাইটগণ ॥

লর্ডগণ নিজেদের জমিদারি সুরক্ষার তাগিদে নিজ নিজ এলাকায় 'ক্যাসল' বা এক অতি সুরক্ষিত বাসস্থান গড়ে তুললেন। এই ক্যাসল সাধারণতঃ পাহাড় বা টিলার ওপর নির্মিত হত। কোন আক্রমণের মুখে ক্যাসল ছিল লর্ড ও তাঁর প্রজাদের আত্মরক্ষার উপযোগী দুর্গ।

ক্যাসেলের গঠন ও গুরুত্ব

প্রথমে ক্যাসল তৈরী হত কাঠ দিয়ে। পরে পাথর দিয়ে তৈরী করা আরম্ভ হয়। চারদিকে থাকতো দুর্ভেদ্য দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে থাকতো ছিদ্র—গোলা বর্ষণ করার জন্য। ক্যাসেলের চারদিক



ক্যাসল



নাইট

ঘিরে থাকতো জলভরা দীর্ঘ পরিখা। পরিখার ওপরে ক্যাসলের প্রধান দরজার সঙ্গে যুক্ত একটা সেতু থাকতো। এই সেতু আক্রমণের সময় তুলে গুটিয়ে রাখা যেত। শত্রুর পক্ষে এই পরিখা এবং লোহার

তৈরী বিশাল দরজা ভেদ করে ক্যাসলের ভেতরে ঢোকা খুব সহজ ছিল না। ক্যাসলের ভেতরের উচ্চ স্থান থেকে আক্রমণকারী শত্রুর ওপর অবিরাম পাথরের চাঁই, গাছের গুঁড়ি, গরম জল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হত। এছাড়া তীর ধনুক তো ছিলই। এসব অগ্রাহ্য করে কোনক্রমে যদি শত্রুপক্ষ সমর্থও হত, তবুও ক্যাসলের ভেতরে ঢোকা হয়ে উঠতো না। কেননা এরপর তাদের আর একটি দেওয়ালের বাধা পেরুতে হত। এই দেওয়াল ছিল প্রথম দেওয়াল থেকে অনেক বেশী উচু, চওড়া এবং মজবুত।

ক্যাসল

ক্যাসলের প্রধান ভবনটি ছিল সবচেয়ে উঁচু। এই ভবনেই লর্ড তাঁর সৈন্যবাহিনী ও ভৃত্যদের নিয়ে থাকতেন। এখানে প্রচুর খাদ্য ও জল মজুত রাখা হত। ফলে যুদ্ধ দীর্ঘদিন চললেও অসুবিধে হত না। লর্ডদের নিজস্ব যোদ্ধাদের বলা হত নাইট। নাইটগণ ছিল সত্যিই সাহসী ও বীর যোদ্ধা। তারা ছিল অশ্বারোহী। হাতে থাকতো ভারী তরবারি বা লম্বা বর্শা। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোহার পোষাকে ঢাকা থাকতো। এমনকি যে ঘোড়া সে ব্যবহার করতো সেই ঘোড়ারও থাকতো লোহার বর্ম। একজন নাইটের পোষাকের ওজনই হত প্রায় পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। এরাই ছিল ক্যাসল-এর প্রধান নির্ভরযোগ্য রক্ষক।

নাইটের পরিচয়

॥ শিভ্যালরির যুগ ॥

লর্ডরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণী। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রথা ছিল ভিন্ন রকমের। লর্ড বংশে ছেলেদের খুব ছোট বয়স থেকে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। সাত বছর বয়স হলে তাদের শিক্ষার জন্য যেতে হত একজন বিখ্যাত যোদ্ধার কাছে। সেই যোদ্ধাই হতেন তার শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে সর্বদা ভৃত্যের মত থাকতে হত তাঁরই বাড়ীতে শিক্ষার্থীকে। এইভাবে সামাজিক আচার-ব্যবহার শিখত ছাত্র এবং

অন্যান্য জ্ঞানও হত শিক্ষার্থীর। সাত বছর তাকে এইভাবে থাকতে হত। তাই তখন তাকে বলা হত 'পেজ' বা বালক ভৃত্য। চোদ্দ বছর বয়স হলে তার পদবী হত 'স্কোয়ার'। এই সময় থেকে তাকে রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হত। তাকে শিখতে হত—ঘোড়ায় চড়তে, বর্শা ও তলোয়ার চালাতে। ভারী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এবং বর্ম, ঢাল-তলোয়ার বইবার শিক্ষাও তাকে দেওয়া হত। সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হত না। অবশ্য লেখাপড়ার তখন প্রচলন ছিল না। তাই মধ্যযুগের লর্ডরা অনেকে নিজেদের নামও লিখতে পারতেন না। একুশ বছর বয়স হলে 'স্কোয়ার', 'নাইট' পদবী পেত।

একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের মধ্যে তাকে নাইট উপাধি দেওয়া হত। যে নাইট হত তাকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকতে হত এবং সমস্ত রাত তাকে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করতে হত। প্রার্থনার পর সে গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে গির্জার বেদীর নিকট যেত। গির্জার পুরোহিত তার গলার তলোয়ার খুলে নিয়ে তাকে আশীর্বাদ করতেন। তারপর তার গলায় ঐ তলোয়ার আবার পরিয়ে দিতেন। এবার যোদ্ধার শিক্ষাগুরু তাঁর শিক্ষার্থীকে নানা অস্ত্রশস্ত্রে সাজিয়ে দিতেন। নাইট পদপ্রার্থী তার সামনে তখন নতজানু হয়ে বসত। এবার গুরু তাকে নাইটের কর্তব্য ও আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। নাইট পদপ্রার্থীকে তখন কতকগুলো প্রতিজ্ঞা করতে হত। প্রতিজ্ঞাগুলো ছিল এরূপ—কাপুরুষতা ত্যাগ করব, কথায়-কাজে ভদ্রতা রক্ষা করব, প্রভুর প্রতি অনুরক্ত থাকব, আর্তকে রক্ষা করব, দুষ্টকে সাজা দেব, নারীর মর্যাদা রাখব ইত্যাদি। গুরু তারপর তরবারির উল্টো দিক দিয়ে তার কাঁধে তিনবার আঘাত করতেন এবং বলতেন ভগবানের নামে তোমায় আমি নাইট উপাধি প্রদান করলাম। তুমি বীর হও, সাহসী হও এবং প্রভু-ভক্ত হও। নাইটদের এই আদর্শের নাম 'শিভ্যালরি' বা বীরব্রত। কোন নাইটের চরিত্রের শিভ্যালরির অভাব দেখা দিলে সকলেই তাকে নিন্দা করত।

নাইটদের আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল টনটনে—কথায় কথায় তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধত। ঝগড়ার মীমাংসা হত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে। তারা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। তাদের দেহে থাকত লোহার বর্ম, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, তাদের হাতে থাকত ঢাল ও লম্বা বর্শা।

শিকার ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা নাইটদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। টুরনামেণ্ট বা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা তাদের প্রিয় ছিল। দুজন নাইটের কৃত্রিম যুদ্ধ ছিল তখনকার দিনের একরকম প্রতিযোগিতা। এই যুদ্ধে তারা ব্যবহার করত ভোঁতা অস্ত্র-শস্ত্র। একজন অপর জনের বর্শা বা তলোয়ার ভেঙ্গে ফেলতে পারলে বা তাকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিতে পারলে সে হত জয়ী। এই জয়ে পুরস্কার বিতরণ করা হত। সেযুগে নাইটদের টুরনামেণ্ট দেখার জন্য ভিড় জমত।

॥ ত্রুবেদুর ঃ গণসাহিত্য ॥

রোম সাম্রাজ্যের আমল থেকে ইউরোপের সর্বত্র রোমান ভাষা অর্থাৎ ল্যাটিন ভাষার প্রচলন হয়েছিল। এই ভাষা ছিল তখন শিক্ষাবিদদের ভাষা। তাই বলে স্থানীয় বা দেশী ভাষার কদর ছিল না, তা নয়। জনগণকে আনন্দ দেবার জন্য সে সময় চারণ কবিরা দেশীয় ভাষায় নানা গাথা ও কাহিনী রচনা করত। অনেক সময় লর্ডদের বাড়ীতে তারা সুর করে ঐসব গাথা-কাহিনী শোনাত। শ্রোতারা তা শুনে মুগ্ধ হত। এই সব চারণ কবিদের গানের বিষয়বস্তু হত সাধারণতঃ দেশের কাজে আত্মত্যাগকারীর বীরত্ব কাহিনী নিয়ে কিংবা কোন নারী বা পুরুষের ভালবাসার কাহিনী বা আত্মত্যাগ ইত্যাদি নিয়ে। ইংলণ্ডের কাল্পনিক রাজা আর্থার, পরোপকারী দস্যু রবিনহুড, ফরাসী বীর রোল্যান্ড প্রভৃতির কাহিনী নিয়েও চারণগণ কাব্য রচনা করত দেশী ভাষায়।

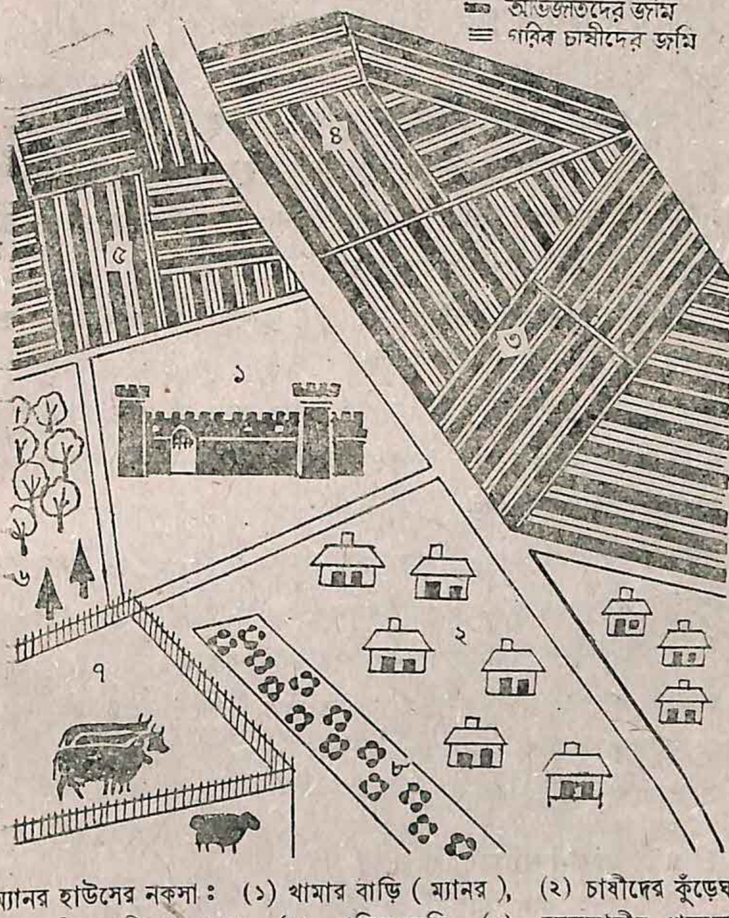
দেশী ভাষায় এইসব চারণ কবিদের বলা হত ত্রুবেদুর। জার্মানীতে এ:দের নাম ছিল মিনিসিঙ্গার, ইংলণ্ডে চারণ কবিদের বলা হত বার্ড।

ইটালীর অধিবাসী দান্তে মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত 'ডিভাইন কমেডি' আজও অমর হয়ে রয়েছে। ইংরেজী ভাষায় এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন 'চসার'। তাঁর লেখা 'ক্যান্টারবেরী টেলস্' আজও আমরা আগ্রহসহকারে পড়ে থাকি।

(খ) ম্যানর প্রথা

মধ্যযুগে লর্ডরা শহরে বাস করতেন না। তাঁরা বাস করতেন গ্রামে, তাঁদের জমিদারির সীমানায়। তাঁদের বাস করবার বাড়ি ছিল বিশেষ এক ধরনের। এই বাড়িকে বলা হত ম্যানর হাউস বা জমিদারের খামার বাড়ি। অনেক জায়গা জুড়ে এই খামার বাড়ি বিস্তৃত থাকত। সহজে যাতে শত্রুরা এই বাড়িতে ঢুকতে না পারে তারজন্য এই বাড়ির চারদিকে থাকত গভীর পরিখা। পরিখার মাটি খামার বাড়ির ভেতর দিকে উঁচু পাঁচিলের মত সাজান থাকত। তার ওপর বড় বড় কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখা হত। বাইরে যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র পথ ব্যবহার করা হত। পরিখার ওপর একটি সেতু দিয়ে যাতায়াত করা হত। দরকার হলে সেতুটি খুলে রেখে দেওয়া যেত। তাহলে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এই খামার বাড়ির মাঝে থাকত লর্ডদের থাকবার ঘরবাড়ি। লর্ডদের এই বাড়িকে সাধারণতঃ ক্যাসল বলত। লর্ডদের বাড়িতে থাকত বড় খাবার ঘর এবং কয়েকটি শোবার ঘর। বাড়ির উঠানের চারদিকে থাকত আস্তাবল, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ও রুটি তৈরীর কারখানা এবং লোকজনদের থাকবার ঘর। প্রত্যেক খামার বাড়িতে একটি করে গির্জা অবশ্যই থাকত। চাষের যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামতের জন্য একটি কারখানাও থাকত। সমস্ত ঘরগুলো সাধারণতঃ কাঠ দিয়ে তৈরী করা হত। এতবড় বাড়িতে বহু লোকজন নিয়ে লর্ডদের থাকতে হত। লর্ডগণ তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের সপ্তাহে দুই বা তিন দিন নিজেদের

বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য করতেন। এইভাবে কাজ করিয়ে নেবার প্রথাকে বলা হয় ম্যানর-প্রথা।



ম্যানর হাউসের নকসা: (১) খামার বাড়ি (ম্যানর), (২) চাষীদের কুঁড়েঘর, (৩) শীতকালীন শস্যক্ষেত্র, (৪) পতিত জমি, (৫) বসন্তকালীন শস্যক্ষেত্র, (৬) বনভূমি, (৭) গোচারণ ভূমি, (৮) ফল-ফুলের বাগান।

॥ ফিউড্যাল সম্পর্ক ॥

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ফিউড্যাল ব্যবস্থাটাই গড়ে উঠেছিল যুদ্ধকালে আত্মরক্ষার তাগিদে। তাই দেখা যায়, লর্ডদের যখনই প্রয়োজন বোধ হত, তখনই তাঁদের অধীনস্থ প্রজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়ে আসত।

তাছাড়া লর্ড-এর বাসগৃহ প্রহরার জন্য প্রহরী সরবহরাহ করতে হত প্রজাদেরই। আবার ম্যানর-এর সুরক্ষার স্বার্থে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতো তারাই। অবশ্য তাদের একটা স্বার্থ নিশ্চয়ই ছিল। তা হল, বিপদকালে তারা ঐ ম্যানরে ঢুকে গিয়েই আত্মরক্ষা করত।

আত্মরক্ষার তাগিদ

জমিদারির সুরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া অন্যান্য কাজগুলো করতে হত সার্ফ বা অধীনস্থ কৃষকদের। এইসব কৃষকদের জমি দিয়েছেন লর্ডগণ। সুতরাং সেই জমির বিনিময়ে কৃষকদের কতকগুলো অপরিহার্য কর্তব্য পালন করতে হত।

এইসব কৃষকেরা লর্ডদের জমি চাষ করতো, ফসল ফলাতো, ফসল কেটে লর্ডদের বাড়ীতে পৌঁছে দিত। এই কাজ করতে গিয়ে তারা যদি তাদের নিজেদের জমি চাষ করার সময় না পেত, বা নিজেদের জমির ফসল নষ্ট হত, তা সত্ত্বেও তাদের লর্ডদের জন্য খাটতে হত। তাছাড়া তাদের লর্ডদের বাড়ি-ঘর মেরামতির কাজ করতে হত, পুষ্করিণী পরিষ্কার করে দিতে হত। কৃষকদের ঘরের মেয়ে-বৌরা লর্ডদের জন্য কাপড় বুনতো, বনজঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে এনে দিত। এই সব নানান ধরনের কাজ, যা কৃষকদের কোন পারিশ্রমিক ছাড়াই তাদের লর্ডদের জন্য করতে হত, তাকে বলা হয় কর্ভি। প্রকৃতপক্ষে লর্ডগণ কৃষকদের কঠোর শ্রমের বিনিময়েই এক নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করার সুযোগ পেতেন।

॥ ফিউড্যাল শাসনব্যবস্থা ॥

লর্ডগণের বাসস্থান বা ম্যানরই ছিল ফিউড্যাল শাসন ব্যবস্থার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। নিজ নিজ এলাকার পরিচালনার জন্য লর্ডগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রজাদের পরামর্শ নিতেন। লর্ডগণ প্রজাদের নিজেদের ম্যানরে ডেকে পাঠাতেন। সেখানে প্রজাদের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটলে অথবা তাদের সঙ্গে প্রজাদেরও কোন বিরোধ বেধে গেলে তার মীমাংসা করা হত। কোন প্রজার

প্রজাদের ভূমিকা

মৃত্যু হলে তার উত্তরাধিকারী জমির ভোগদখল নেবার আগে, তার লর্ডকে উপঢৌকন দিতে হত। আবার লর্ডের ব্যয়বহুল কোন কাজে তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিতে হত প্রজাদের। যেমন লর্ডের ছেলেমেয়ের বিয়ে, যুদ্ধকালে, অথবা নতুন ক্যাসল নির্মাণ কালে ইত্যাদি।

প্রজাগণ যে তাদের লর্ডদের জন্য এত কাজ করে দিত তার বিনিময়ে যে কাজটি ছিল লর্ডদের অবশ্য করণীয় তা হল তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের যে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তাঁদের আর একটি কর্তব্য হল, তাঁদের কাছে বিচারপ্রার্থী প্রজাগণ যেন সুবিচার পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যদি কোন প্রজা মনে করত যে তার লর্ড তার প্রতি সুবিচার করেন নি, সে ক্ষেত্রে সে তার অন্যান্য সহকর্মীর সামনে পুনর্বিচার দাবী করতে পারত। লর্ড তার সে দাবী মেনে নিতে বাধ্য থাকতেন। তাছাড়া প্রত্যেক প্রজার পারিবারিক মর্যাদার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হত লর্ডদের। যদি কোন প্রজা মনে করত, লর্ড তাঁর দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে সে তার লর্ডকে মেনে নিতে অস্বীকার করতে পারত। অবশ্য এমন ঘটনা ঘটত খুব কমই। কারণ একজন লর্ডের বিরুদ্ধে যাওয়ার মত শক্তি সাধারণতঃ প্রজাদের থাকত না।

লর্ড-এর ভূমিকা

॥ ফিউড্যাল প্রথায় শ্রেণীবিভাগ ॥

মধ্যযুগের ইউরোপে জমিদারি বা ফিউড্যাল প্রথার বিকাশ যেভাবে ঘটেছিল তাতে তখনকার সমাজজীবন পরিষ্কার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই তিন শ্রেণী হল অভিজাত সম্প্রদায়, ধর্মীয় যাজক সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ। রাজার কাছ থেকে জমির স্বত্ব পেত অভিজাত সম্প্রদায়। এদেরই বলা হয়েছে লর্ড। বিনা পরিশ্রমে এরা এক বিলাসবহুল জীবন-যাপন করত। শুধু তাই নয়। এরা ছিল সমাজজীবনে

অভিজাতদের অবস্থা

সর্বাধিক প্রভাবশালী। এরপর আসে যাজক সম্প্রদায়। এই সময় বহু লোক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ভূসম্পত্তি দান করতো। এক একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকতো বিপুল পরিমাণ জমি।

যাজকদের অবস্থা

এইসব জমি যাজক সম্প্রদায় ঠিক লর্ডদের মতই কৃষকদের বন্দোবস্ত করে দিত। ফলে তারাও কৃষকদের পরিশ্রমের বিনিময়ে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন-যাপন করতে পারতো। তা ছাড়া এরা সমাজজীবনে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সব সময়েই সমাজের সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী লর্ডদের স্বার্থরক্ষা করে চলতো।

সমাজে সবচেয়ে করুণ অবস্থা ছিল সাধারণ মানুষদের। সাধারণ বলতে প্রধানতঃ কৃষকদেরই বোঝাতো। কেননা তখন পর্যন্ত জমিই ছিল মানুষের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। তাই কৃষকদেরই

সাধারণ মানুষের ভূমিকা

সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে হত। অন্যান্য জীবিকার লোকের সংখ্যা ছিল খুব নগণ্য। বরং বলা যায়, কৃষকগণ কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের অন্যান্য কাজও করতো। কিন্তু যে পরিমাণ পরিশ্রম এইসব মানুষদের করতে হত তার বিনিময়ে সমাজ তাদের দিত না কিছুই। এক অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে তারা কোন রকমে বেঁচে থাকতো মাত্র।

॥ কৃষকদের অবস্থা ॥

তখন দেশের লোকসংখ্যায় অধিকাংশই ছিল কৃষক। কৃষকেরা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগকে বলা যায় স্বাধীন কৃষক। এরা জমিদারকে উৎপন্ন ফসলের এক অংশ খাজনা হিসেবে দিত। কখনো

স্বাধীন কৃষক

বা জমিদারের নিজস্ব জমিতে চাষের কাজ করে দিত। তাছাড়া তাদের আর কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। জমিদারও এদের কাছ থেকে খাজনা পেয়ে খুশী থাকতেন

এবং এদেরও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতেন। তবে এই ধরনের কৃষকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

সার্ফ

কৃষকদের অন্য ভাগকে বলা হয় সার্ফ। স্বাধীন কৃষকদের মত অত স্বাধীনতা এদের ছিল না। এরা কখনো প্রভুর জমি ত্যাগ করে যেতে পারতো না। জমিদারের নিজের গ্রামে বা খামারের বাড়িতে এরা থাকতো।

লর্ডের অত্যাচার

লর্ডের সীমাহীন ক্ষমতা সম্বন্ধে সার্ফগণ সব সময়ই সজাগ ছিল। যেমন, কোন বৃদ্ধ সার্ফ মারা গেলে লর্ডের প্রহরী এসে মৃতের কোন একটি গরু নিয়ে যাবার পর মৃতদেহ কবরস্থ করা হত। সার্ফের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হলে লর্ডকে ভেট পাঠাতে হত। সবচেয়ে দুঃখজনক ছিল লর্ডদের শিকার পদ্ধতি। সাধারণতঃ যখন ক্ষেতে ফসল পাকতো, তখন নানা পশু-পাখী ফসল খাবার লোভে এসে জুটতো। তাই লর্ডগণ এ সময়টাকেই শিকারের সময় বলে বেছে নিতেন। কোন শিকার যখন ক্ষেতে পালিয়ে যেত, তখন লর্ডের লোকজন সেই শিকার খুঁজতে গিয়ে ফসলভরা ক্ষেত তছ্‌নছ্‌ করে দিত। অসহায় কৃষক তাকিয়ে দেখতো, বুক চাপ্‌ড়াতো, প্রতিবাদ করবার কোন অধিকার তো তার ছিল না।

কৃষি ব্যবস্থা

সার্ফগণ চিরাচরিত সরঞ্জাম দিয়েই কৃষিকাজ করতো। ক্ষেতে সার দেবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রধান হল—ছাগল, ভেড়া এবং শূকর। ঘোড়া এবং গরু বেশী তারা রাখতো না। কারণ এদের খাদ্য খড়-বিচালী খুব সহজলভ্য ছিল না।

সার্ফগণ জমিদারদের জমি নিয়েই এত বিব্রত থাকতো যে নিজেদের জমি সম্পর্কে যত্ন নেবার যথেষ্ট সময় পেত না। তার ফলে তাদের নিজস্ব জমির উৎপাদন ছিল খুবই কম। তাও আবার সামান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয়ে যেত। তখন সার্ফদের অনাহারে মৃত্যু ছাড়া অন্য পথ ছিল না।

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিন-জমি চাষ প্রথার প্রবর্তন হয়। এর অর্থ হল: মোট চাষযোগ্য জমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হত। একভাগ জমি শীতকালে, দ্বিতীয় ভাগ বসন্তকালে ব্যবহার করা হত। তৃতীয় ভাগ ফেলে রাখা হত। এই ব্যবস্থা চলতো পর্যায়ক্রমে। ফলে একই জমিতে একই সময়ে পর পর দু বছর ফসল ফলানো হত না। ফলে জমি বিশ্রাম পেত। শুধু তাই নয়। এই বিশ্রাম দেবার ফলে জমির সারের অভাবও অনেকটা মিটতো। এই ব্যবস্থার ফলে শস্যের উৎপাদনও বেড়ে যেত অনেক।

তিন-জমি চাষ ব্যবস্থা

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কৃষকদের কুঁড়েঘর নিয়ে গঠিত হত গ্রাম। কুঁড়েঘরগুলো ছিল কাঠের তৈরী, ওপরে থাকতো খড়ের ছাউনি। শীতকালে ঘরের ভেতরে যখন আগুন জ্বালানো হত, তখন সারা ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে এক দমবন্ধ হওয়া অবস্থা হত। জানালার মত যে ছিদ্রপথ থাকতো তা দিয়ে যথেষ্ট আলোবাতাসও ঘরে আসতো না। শীতকালে ছিল আর এক অসুবিধে। শীতের প্রচণ্ড দাপট থেকে গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করার জন্য সেগুলোকেও ঐ ঘরের ভেতরেই নিয়ে আসতে হত। ফলে মানুষ আর পশুতে মিলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবার সে এক করুণ সহ-অবস্থান। পশুর মত মানুষকেও খড় বিচালি বিছিয়ে শীত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হত। এমনি ছিল সার্ফদের দৈনন্দিন জীবনধারণের শোচনীয় অবস্থা।

জীবনধারণের পদ্ধতি

কিন্তু এখানেই তাদের দুঃখময় জীবনের শেষ নয়। লর্ড এবং যাজক সম্প্রদায়ের নিদারুণ করভার ছিল সার্ফদের জীবনে এক দুর্বহ বোঝার মত। সার্ফগণ যা কিছু উৎপাদন করতো তার একাংশ তাদের খাজনা হিসেবে দিতে হত লর্ডদের। লর্ডগণও নিত্য নতুন উপায়ে সার্ফদের শোষণ করে চলতেন। যেমন লর্ডগণ সার্ফদের বাধ্য করতো তাদের মেসিনে গম

দুর্বহ করভার

পেষাই করতে বা রুটি বানাতে। আবার লর্ডদের মেসিনে ব্যবহার করার জন্য দিতে হত খাজনা। কিংবা রাস্তা-ঘাট, সেতু এমন কি নদী ব্যবহার করার জন্যও সার্ফদের খাজনা দিতে হত। অন্যদিকে যাজক সম্প্রদায়ও সার্ফদের দোহন করতো সমান ভাবে। উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ সার্ফদের দিতে হত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কর হিসেবে। আবার গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেলে তার ওপরও থাকতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দাবী।

এইভাবে অসংখ্য করভারে নির্যাতিত হত সার্ফগণ। এই করভার থেকে অব্যাহতি তাদের তো মিলতোই না, বরং ক্রমশঃ দিনের পর দিন তার পরিমাণ যেত বেড়ে। আবার পশুর মত জীবন থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায়ও ছিল না সার্ফদের। কেননা পুরুষানুক্রমিকভাবে সার্ফদের সন্তান সার্ফই হতে হত।

॥ সার্ফ বিক্ষোভ ॥

নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার মানুষ কতদিন মুখ বুজে সহ্য করতে পারে? প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে এক সময় মানুষ মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করে। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল সার্ফদের ক্ষেত্রেও। অত্যাচারে তারা ছিল এমনই জর্জরিত যে তাদের আর মাথা পেতে মুখ বুজে মেনে নেবার কোন উপায় ছিল না।

গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন

তাদের একটা সুবিধেও ছিল। সার্ফগণ থাকতো গোষ্ঠীবদ্ধভাবে। তারা পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমেই নিজেদের সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে অভ্যস্ত ছিল। ফলে চরম নির্যাতনের মুখে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তারা চেষ্টা করলো পারস্পরিক সাহায্যের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ধারণের সংকট থেকে মুক্তি পাবার।

দেখা গেল, যখন লর্ডদের লোভ সব সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন

সার্ফগণও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কখনো লর্ডের জমিতে চাষ করা বন্ধ করলো, কখনো লর্ডের ভরা ফসলের মাঠে আগুন লাগিয়ে দিত, কখনো লোভী নিষ্ঠুর জমিদারকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টাও করতো। কখনো বা দুঃসাহসী সার্ফ বনে-বাদাড়ে পালিয়ে যেত, আর সুযোগ খুঁজতো অত্যাচারী জমিদারকে উচিত শিক্ষা দেবার।

বিদ্রোহের প্রকাশ

অন্যদিকে লর্ডগণও সার্ফদের এই সব বিদ্রোহকে দারুণ ভয় পেত। কখনো কখনো সার্ফদের বিদ্রোহ গোটা জমিদারি জুড়ে ছড়িয়ে যেত। এই অবস্থায় লর্ডগণ কিছু সুযোগ সুবিধেও দিতেন সার্ফদের। কিন্তু এসব ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। চারদিকে অবস্থা শান্ত হলে লর্ডগণ আবার আগের চেহারায় ফিরে আসতেন।

লর্ডদের ভীতি

ঠিক এই সময়ই পূর্ব সাম্রাজ্যের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে যে ধর্মযুদ্ধের আহ্বান আসে রোমের পোপের কাছ থেকে, তার সুযোগ নিয়ে হাজার হাজার সার্ফ ঐ যুদ্ধে যোগ দেয়। তারা ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল বটে, আসলে তাদের লক্ষ্য ছিল ঐ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ফিউড্যাল ব্যবস্থার অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করা। প্রকৃতপক্ষে ঐ ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে হাজার হাজার সার্ফ সত্যিই নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিল।

ধর্মযুদ্ধের সুযোগ

এদিকে গ্রামভিত্তিক পশ্চিম ইউরোপে ক্রমশঃ শহর গড়ে উঠতে থাকে। যে সব স্থানে শহর গড়ে উঠতে থাকে সেই সব স্থানকে ফিউড্যাল শাসন মুক্ত করার জন্য আরম্ভ হয় আর এক সংগ্রাম। তাছাড়া শহরে নানা শিল্প, কারখানা গড়ে ওঠার ফলে নানা রকম জীবিকাও সৃষ্টি হতে থাকে। তাই সার্ফগণ স্বভাবতঃই মুক্তি পাবার আশায় শহরের দিকে পালিয়ে যেতে থাকে, সেখানে নানা রকম জীবিকায় ক্রমশঃ তারা যুক্ত হতে থাকে। আর যারা গেল না, তারা লর্ডদের বিরুদ্ধে আরও তীব্র লড়াই করার জন্য

ফ্রান্সের বিদ্রোহ

তৈরী হতে থাকে। এমনি এক ভয়ংকর কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

একটি বিশৃঙ্খল সমাজজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার তাগিদে একদা ইউরোপে এসেছিল সমাজতন্ত্র। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সামন্ত-তন্ত্রই হয় সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন করার একটি কৌশল। আবার এই কৌশলও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিন সাধারণ মানুষ সেই অকথ্য অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে সামন্ততন্ত্রের সমস্ত কৌশলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। ফিউড্যাল শব্দটির অর্থ কি? এই ব্যবস্থার উদ্ভব হল কেন? এই ব্যবস্থাটি কি রকম?

২। 'ক্যাসল' বলতে কি বোঝ? এর গঠন কেমন ছিল? ক্যাসল গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছিল কেন?

৩। নাইট বলা হত কাদের? কিভাবে নাইট হতে হত? নাইটদের আদর্শ কি ছিল? তাদের কি কি কাজ করতে হত?

৪। ফিউড্যাল প্রথা কিভাবে পরিচালিত হত নিজের ভাষায় লিখ।

৫। ফিউড্যাল প্রথায় কয়টি শ্রেণী ছিল? শ্রেণীগুলো কি কি? কোন্ শ্রেণী সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ছিল এবং কেন ছিল? কোন্ শ্রেণী ছিল সর্বাধিক দুর্বল?

৬। আজকের দিনে যদি তোমাকে নাইট উপাধি দেওয়া হয় তাহলে তুমি কোন্ কোন্ কাজকে তোমার আদর্শ বলে গ্রহণ করবে এবং কেন?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
শিভ্যালরি, ক্রবেডুর, ম্যানর প্রথা, সার্ফ, তিন-চাষ পদ্ধতি।

২। ক্যাসল তৈরী হত কোথায়? কি কি কাজে ক্যাসল ব্যবহার করা হত?

৩। নাইট বলা হত কাদের? তারা কি ধরনের পোষাক পরতো?

৪। কি কি কারণে সার্ফগণ বিদ্রোহ করতে সাহস পেয়েছিল?

৫। ফিউড্যাল প্রথায় রাজার বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না কেন ?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

অ) ফিউড্যাল প্রথায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলা হত —।
আ) মধ্যযুগে মানুষের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল —।
ই) মধ্যযুগের বীর যোদ্ধাদের বলা হত —।
ঈ) নাইটদের জীবনের আদর্শ ছিল —।
উ) মধ্যযুগের চারণ কবিদের বলা হত —।
ঊ) ফ্রান্সের ভয়ংকর কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল — সালে।

২। নীচের প্রশ্নগুলোর পাশে বন্ধনীর মধ্যে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের কর।

অ) ফিউড্যাল প্রথার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কি বলা হত ?
(ব্যারণ, নাইট, সেইনোর, ভেসেল)

আ) জমিদারদের মর্যাদা বেড়েছিল কেন ?
(অনেক জমি ছিল বলে, নিরাপত্তার তাগিদে, শক্তিশালী বলে ?

ই) শিক্ষাগ্রহণকালে চৌদ্দ বছরের অভিজাত সন্তানকে কি বলা হত ?
(পেজ, স্কোয়ার, নাইট)

ঈ) তিন-চাষ প্রথার প্রচলন হয়েছিল কেন ?
(জমির পরিমাণ কম ছিল বলে, জমি বিশ্রাম পেত বলে, লোক-সংখ্যা কম ছিল বলে)

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। উপজাতিদের আক্রমণে লোকেরা শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়েছিল কেন ?
২। ব্যারণ কাদের বলা হয় ?
৩। ফিউড্যাল সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী ছিল না কেন ?
৪। ইংলণ্ডে চারণ কবিদের কি বলা হত ?
৫। নাইটদের আদর্শের নাম কি ?
৬। কর্ভি কাকে বলে ?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

(১) ফিউড্যাল প্রথার গঠন দেখিয়ে একটি চার্ট তৈরী কর।
(২) লর্ডদের ক্যাসেল-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি মডেল তৈরী কর।
(৩) ম্যানর-হাউসের একটি নকসা তৈরী কর।

———

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

ধর্মযুদ্ধের কথা

বিষয়-সংকেতঃ ধর্মের মধ্যে মানুষ যেমন নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করতে চেয়েছে, তেমনি ধর্মই আবার কত মানুষের রক্তে নদী তৈরী করেছে তারও ঠিক নেই। ধর্মকে কেন্দ্র করে এমনি এক দীর্ঘকালীন যুদ্ধের কাহিনী এবার আমরা জানবো।

॥ ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের কারণ ॥

মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা হল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধ হয়েছিল খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে।

জেরুজালেম ছিল খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর অল্পকাল পরে আরবগণ আক্রমণ করে জেরুজালেম অধিকার করে নিয়েছিল। তারা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর কোন অত্যাচার করতো না, তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণেও বাধা দিত না। কিন্তু আরবদের হাত থেকে জেরুজালেমের অধিকার তুর্কীদের হাতে গেলে অবস্থা অন্য রকম হল। তারা খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করলো। ফলে খ্রীষ্টানদের মধ্যে দারুণ হতাশার সৃষ্টি হয়। পিটার নামে এক খ্রীষ্টান সাধু সারা ইউরোপময় এই সব অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করতে লাগলেন। স্বভাবতঃই দেখা গেল এক দারুণ উত্তেজনা।

এই অবস্থায় যীশুর পবিত্র সমাধিস্থান জেরুজালেম উদ্ধার করবার জন্য রোমের পোপ বারবার ক্রুসেড ঘোষণা করেন। এই ধর্মযুদ্ধে ইউরোপের জনসাধারণ বিশেষ করে সার্ফরা, ব্যবসায়ীরা, জমিদারবর্গ, এবং রাজারা যোগদান করেন। যারা এই ধর্মযুদ্ধে যেত তাদের জামায় ক্রুস চিহ্ন থাকত। তাই এই ধর্মযুদ্ধকে ক্রুসেড বলা হয়।

ধর্মযুদ্ধের পেছনে ধর্ম নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় কারণ। কিন্তু অন্যান্য কতকগুলো কারণও ছিল। সে সময় ইউরোপে নতুন শহর গড়ে ওঠায় এবং বাণিজ্যের প্রসার হেতু ফিউড্যাল লর্ডদের

ধনলিপ্সা বাড়তে থাকে। ধন-সম্পত্তি পাবার জন্য জমিদার শ্রেণীর মানুষ এই যুদ্ধে যোগদান করে। সার্ফরা নিজেদের মুক্ত করবার জন্য এই যুদ্ধে যোগদান করে। নাইটরা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাবার জন্য এই যুদ্ধে যেতেন। এমন কি পোপের আবেদনেরও উদ্দেশ্য ছিল অন্য। কনস্টান্টিনোপলের খ্রীষ্টানরা রোমের কর্তৃত্ব মানত না। এসময় তুর্কীরা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে। ফলে নিরুপায় হয়ে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট রোমের পোপের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই পরিস্থিতিতে পোপ ভাবলেন; জেরুজালেমের তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সম্রাটকে সাহায্য করা হবে আবার বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর কর্তৃত্বও করা যাবে। সুতরাং রোমের পোপ ক্রুসেডে যোগদান পবিত্র কর্তব্য বলে প্রচার করেন।

প্রথম ক্রুসেড যুদ্ধ ঃ ক্রুসেড যুদ্ধ হয় আটবার। প্রথম ক্রুসেড বাহিনী যাত্রা করে ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম বাহিনীতে ছিল যুদ্ধবিদ্যা না জানা অশিক্ষিত জনসাধারণ, প্রধানতঃ সার্ফগণ। ফিউড্যাল লর্ডদের অত্যাচার এবং কয়েক বৎসর ধরে অজন্মায় তাদের অশেষ দুর্গতি সার্ফগণকে এই যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহিত করেছিল। তারা এই যুদ্ধকে মুক্তির উপায় বলে গ্রহণ করলো এবং ভেবেছিল নতুন দেশে গিয়ে তারা আবার স্বাধীন কৃষকরূপে বাঁচতে পারবে। তুর্কীরা এই দলকে সহজেই পরাজিত করে। তাদের অভিযান ব্যর্থ হল। প্রথম দলের পরাজয় সংবাদ ইউরোপে পৌঁছুলে দ্বিতীয় দল যাত্রা করল। গডফ্রে নামে এক নরম্যান এই দলের নেতা হলেন। এই দল তুর্কীদের পরাস্ত করে জেরুজালেম অধিকার করে। কিন্তু কিছুকাল পর তুর্কীরা খ্রীষ্টানদের পরাস্ত করে জেরুজালেম অধিকার করে নিয়েছিল।

প্রথম ক্রুসেডের পঞ্চাশ বছর পর দ্বিতীয় অভিযান আংশিক সফল হলেও সেই সাফল্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

॥ তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ ॥

তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের সূচনা হয় ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। যুদ্ধের নায়ক

ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বারোসা। এঁরা দুই দিক থেকে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হলেন। জার্মান বাহিনী অনেক কষ্টে এশিয়া মাইনরে পৌঁছুলেও শেষ পর্যন্ত পথের কষ্টে এবং তুর্কীদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। এমন কি ফ্রেডারিক নিজে নদী পেরুতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যান। তাই জার্মানরা আর অগ্রসর না হয়ে দেশে ফিরে যায়।

অন্যদিকে রিচার্ড ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসকে নিয়ে জেরু-জালেমের কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন। পথে দুই রাজার ঝগড়া হওয়ায় ফিলিপ সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেশে ফিরে যান। রিচার্ড একাই যুদ্ধ করেন। কিন্তু দুই বৎসর যুদ্ধের পরও তিনি তুর্কী সেনাপতি সালা-দিনকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে এক সম্মানজনক সন্ধি স্থাপিত হয় এবং এইভাবে তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। সন্ধি অনুযায়ী স্থির হয়, জেরুজালেমে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুখ-সুবিধের নিশ্চিত ব্যবস্থা করা হবে।

॥ চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ ॥

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ অভিযান পাঠাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তাঁর নেতৃত্বে ইউরোপের বীর ও রাজারা ইটালিতে সমবেত হলেন। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি কমাবার উদ্দেশ্যে তিনি ভেনিসের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জাহাজ চাইলেন। ভেনিস ছিল তখনকার দিনের এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কনস্টান্টিনোপল। তাই ভেনিসের ব্যবসায়ীরা সব-সময়ই চাইতো কনস্টান্টিনোপলের পতন। আজ যখন ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনে ভেনিসের সাহায্য চাওয়া হল, তখন ওখানকার ব্যবসায়ীরা এক ঢিলে দুই পাখি মারার এক কৌশল স্থির করলো। পোপের চাহিদা মত সৈন্যবাহিনীকে জাহাজ দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু সেই জাহাজ কনস্টা-

ন্টিনোপলের বেশী আর যেতে চাইলো না। ফলে সৈন্যবাহিনী কনস্টান্টিনোপলের ধন-রত্ন লুটপাট করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অতীতের এই বিখ্যাত শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো। এরপর সৈন্যবাহিনী আর অগ্রসর না হয়ে দেশে ফিরে এল। এভাবে চতুর্থ ধর্মযুদ্ধও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

কিন্তু এই ধর্মযুদ্ধের সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান সৈন্যবাহিনীর হাতে পূর্বদিকের খ্রীষ্টানদের বড় গৌরব আর আদরের শহর ধ্বংস হয়ে গেল, বিশেষ করে যখন সেই সৈন্যবাহিনী খ্রীষ্টানদের মর্যাদা রক্ষা করতেই যুদ্ধ যাত্রায় বেরিয়েছিল। যে মূল লক্ষ্য নিয়ে তারা এসেছিল তা অসম্পূর্ণ রেখে তারা প্রকারান্তরে এক লজ্জাজনক আত্মহননের পথই বেছে নিল।

এরপর আরও চারটি অভিযান পাঠানো হয়েছিল। প্রতিটি অভিযানের পেছনেই ফিউড্যাল লর্ডদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কিন্তু এতবার অভিযান পাঠানোর ফলে চরম ক্ষতি হয়েছিল ইউরোপের, কিন্তু পূর্ব দিকের কোন শহরই তারা দখলে রাখতে পারে নি।

॥ ধর্মযুদ্ধের ফলাফল ॥

সাধারণ বিচারে ধর্মযুদ্ধের ফলাফল ইউরোপের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় নি। যত ক্ষতি হয়েছিল তার তুলনায় পাওয়া যায় নি কিছুই। কিন্তু অন্যদিক থেকে ধর্মযুদ্ধ সমগ্র ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই ক্রুসেড যুদ্ধ ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের অবসান সূচনা করে। অনেক বীর নাইট এই যুদ্ধে মারা যান, বহু সামন্ত এই যুদ্ধে শেষ হয়ে যান। সার্ফরা মুক্তি পায়। অর্থাৎ যে ভিত্তির ওপর সামন্ততন্ত্র দাঁড়িয়েছিল সেই ভিত্তিটাই গেল পাল্টে। ফলে, রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হল, সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার। উত্তর ইটালির শহরগুলো এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধে কন- **ব্যবসার-প্রসার** স্টান্টিনোপলের প্রাধান্য ধ্বংস হয়ে যায়। তার পক্ষে আর ইটালির শহরগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার শক্তি থাকে না। ফলে ভেনিস, জেনেভা প্রভৃতি শহরের ব্যবসায়িগণ এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করে ব্যবসা-কেন্দ্র গড়ে তুলতে থাকে।

তাছাড়া পূর্ব দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় দেশগুলো অনেক নতুন ফসল ও ফলের সঙ্গে পরিচিত হয়। এইসব নতুন ফসল ইউরোপেও উৎপাদন করার **নতুন কৃষিজ পণ্য** চেষ্টা আরম্ভ হয়। এইসব ফসলের মধ্যে প্রধান হল, চাল, লেবু, তরমুজ ইত্যাদি।

শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রেও ধর্মযুদ্ধের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। পূর্ব দেশীয় দেশগুলোর কাছ থেকেই ইউরোপ সিল্ক ও আয়না বানানো শিখেছিল। নানা প্রকার ধাতু থেকে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরী করার কৌশলও ইউরোপ ঐ সব দেশ থেকেই শিখেছিল। এইসব জিনিসপত্র **কুটির শিল্পের বিকাশ** তৈরী করার কারখানা ধীরে ধীরে ইউরোপেও গড়ে উঠতে থাকে। এইভাবে ইউরোপে কুটির শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়ে ওঠে এবং কৃষিনির্ভর ইউরোপের চেহারা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে শিল্প প্রসারের মধ্য দিয়ে।

এই যুদ্ধের সময় ইউরোপের মানুষ মুসলমানদের চর্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে এবং পরে নিজেরা ঐসব বিষয় চর্চা করে। তারা নানা ওষুধের ব্যবহার শেখে। **জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা** অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা তারা আরবদের কাছ থেকেই শিখেছিল। এমন কি গ্রীক দর্শন, যা এতকাল পূর্বদিকেই পরিচিত ছিল, তা' আবার নতুন করে ইউরোপে প্রচারিত হতে থাকে।

ইউরোপের দৈনন্দিন জীবনধারাতেও পূর্ব দেশগুলোর প্রভাব দেখা

যায়। ইউরোপ এদের কাছ থেকেই খাদ্য গ্রহণের আগে হাত ধোওয়া বা গরম জলে স্নান করা ইত্যাদি শিখেছিল। ফিউড্যাল লর্ডগণ এদের কাছ থেকেই আরও বেশী বিলাসবহুল জীবন-যাপন কৌশল জানতে পেরেছিল। যেমন সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার, সুদৃশ্য বাসনের ব্যবহার, কার্যকরী অস্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি।

জীবনধারার পরিবর্তন

ধর্মযুদ্ধের আর একটি বড় শিক্ষা হল, যদিও এই যুদ্ধ জেরুজালেম জয়ে সমর্থ হয় নি, তথাপি এই যুদ্ধ ইউরোপের খ্রীষ্টান দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তুলেছিল। এই ঐক্য-বোধের ফলেই পরবর্তী-কালে মুসলমানগণ ইউরোপে অধিকতর সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় সফল হতে পারে নি।

ঐক্যের শিক্ষা

সর্বশেষ ধর্মযুদ্ধের মধ্য দিয়েই ইউরোপ মুসলমানদের উন্নত ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এই সব নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সমগ্র ইউরোপের চিন্তা জগতে এনেছিল এক বিরাট পরিবর্তন। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বিচার করার মনোভাব গড়ে তোলে ইউরোপ-বাসীদের মধ্যে। এরই ফলে পরবর্তীকালে ইউরোপে নবজাগরণ বা রেঁনেসাঁর পথ তৈরী হয়ে যায়।

চিন্তাজগতে পরিবর্তন

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

জেরুজালেমের দখল নিয়ে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল-ব্যাপী লড়াই-ই ইতিহাসে ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। কিন্তু এই যুদ্ধের পরিণতিতে কোন পক্ষই চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তা না হলেও এই যুদ্ধ ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। ক্রুসেড বলতে কি বোঝ? ক্রুসেডের প্রধান কারণ কি?

২। ফিউড্যাল লর্ডগণ কেন পূর্বদিকের দেশগুলো সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন? এই দেশগুলোর অবস্থা কেমন ছিল?

৩। প্রথম ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল কত সালে? এই যুদ্ধে প্রধান অংশগ্রহণকারী ছিল কারা? তারা অংশ নিয়েছিল কেন?

৪। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের নায়ক ছিলেন কারা? জার্মান সম্রাটের পরিণতি কি হয়েছিল? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

৫। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে? কত খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়েছিল? এই যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। পূর্বদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপের মনোভাবে কি পরিবর্তন আনে?

২। প্রথম ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে সার্ফগণ কি আশা করেছিল? শেষ পর্যন্ত তারা কি পেয়েছিল?

৩। ধর্ম ছাড়া ধর্মযুদ্ধের অন্যান্য কারণগুলি কি কি?

৪। ধর্মযুদ্ধের পেছনে পোপের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল?

৫। ধর্মযুদ্ধের ফলে রাজতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি পেয়েছিল কেন?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(অ) ধর্মযুদ্ধের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল হল —— প্রসার।

(আ) নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে এনেছিল ——।

(ই) —— নামে এক সাধু গ্রামে-শহরে খ্রীষ্টানদের ওপর অত্যাচারের কথা প্রচার করে বেড়াতেন।

(ঈ) যীশুর সমাধি ছিল —— শহরে।

২। নীচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর :—

(অ) হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তুর্কীগণ জেরুজালেম অধিকার করে নেয়।

(আ) প্রথম ধর্মযুদ্ধে ইউরোপীয় দলের নেতৃত্ব করেন পিটার নামে এক নরম্যান।

(ই) আরব ইউরোপের কাছ থেকেই অংকশাস্ত্র শিখেছিল।

(ঈ) যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার মনোভাবই ধর্মযুদ্ধ।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। ধর্মযুদ্ধকে ক্রুসেড বলা হয় কেন?

২। ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য পোপ আহ্বান জানিয়েছিলেন কেন?

৩। ইংলণ্ডের কোন রাজা ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন?

৪। জার্মানরা কেন তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে যোগ না দিয়ে ফিরে যায়?

৫। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের সময় তুর্কী সেনাপতি কে ছিলেন?

নবম অধ্যায়

ইউরোপে শহরের উৎপত্তি

বিষয়-সংকেত: সভ্যতার জয়যাত্রায় কত না উত্থান-পতন কতই না বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এক সময় মানুষ তার প্রয়োজনে গড়ে তুলেছিল শহর। মানুষের হিংস্রতাই একদিন সেইসব শহরকে শ্মশানে পরিণত করে। কিন্তু মানুষ থেমে থাকলো না, তাই প্রয়োজন এসে মানুষকে আবার নতুন করে তাগিদ দিতে লাগলো শহর গড়ে তোলার।' কি সেই তাগিদ—এবারে তাই আমরা জানবো।

॥ শহরের গোড়াপত্তন ॥

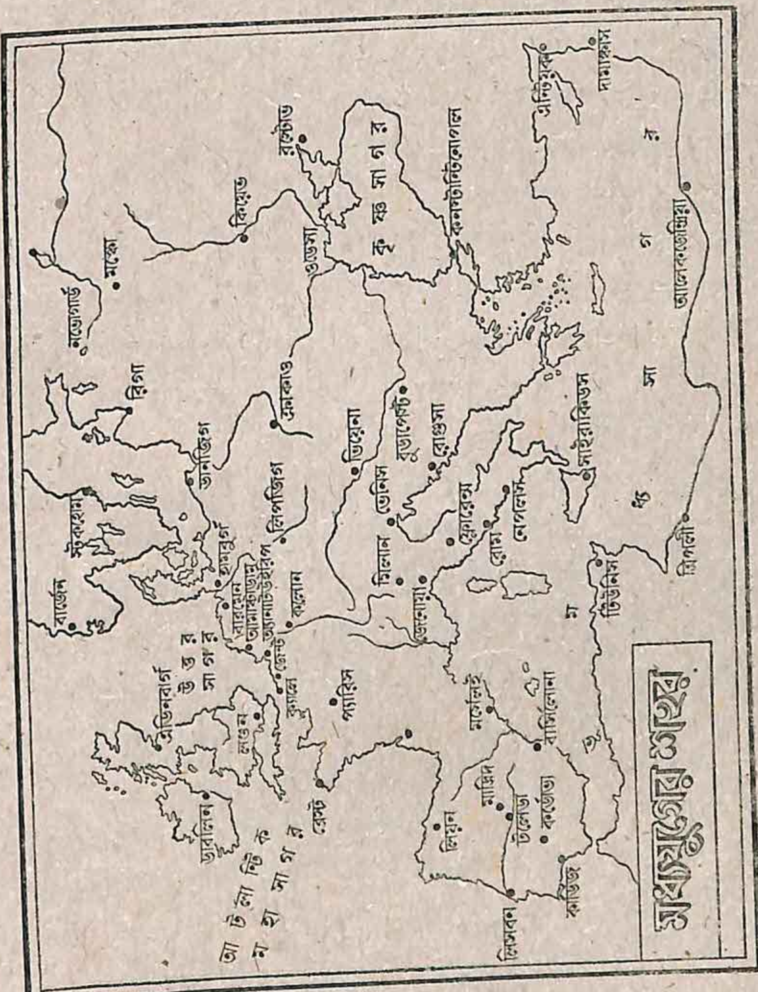
রোম সাম্রাজ্যে ইউরোপে শহর যে ছিল না তা নয়। কিন্তু সেই শহরগুলো বর্বর উপজাতিদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এই সময় অধিকাংশ লোক বাস করত ম্যানরে বা গ্রামে। এই সময় লোহার আবিষ্কার হওয়ায় এবং মানুষের প্রয়োজনে নানা জিনিসপত্র তৈরী হতে লাগল। সে সময় লোকেরা জিনিসপত্র বেচা-কেনার জন্য হাটে-বাজারে মিলিত হত এবং ধর্ম অর্জনের জন্য বড় বড় গির্জায় তীর্থ-যাত্রা করত। এসব লোকেরা থাকা-খাওয়ার জন্য ঐ সব স্থানে দোকান-পাট, হোটেল-রেস্তোঁরা স্থাপিত হয়। তাই দেখা যায় বাজার ও গির্জাগুলোকে কেন্দ্র করেই ইউরোপে শহরগুলো গড়ে উঠতে থাকে এবং এই শহরগুলো স্থাপিত হত হয় বড় রাস্তার পাশে না হয় নদীর তীরে। তাতে যাতায়াত এবং ব্যবসার সুবিধে হত। এই জাতীয় শহরগুলোকে তখনকার ডাকাতের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হত।

॥ গিল্‌ডের গঠন ও ভূমিকা ॥

কিন্তু ক্রমশ এক সমস্যার সৃষ্টি হল। কারিগরদের তৈরী জিনিসের চাহিদা থাকলেও তার একটা সীমা ছিল। সেই সীমা ছাড়িয়ে গেলেই নানান অসুবিধের সৃষ্টি। যেমন চাহিদার তুলনায় বেশী উৎপাদন হলে জিনিসের দাম কমে যেত। আবার ক্রেতাও চাইতো যত

কম দামে জিনিস কেনা যায়। ফলে বিভিন্ন বিক্রেতার মধ্যে এক অপ্রীতিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হত। তাই যে-সব কারিগরেরা একই শহরে থেকে একই ধরনের জিনিস তৈরী করতো তারা একত্র হয়ে নিজেদের এক সংগঠন গড়ে

গিল্‌ড গঠন



তোলে। এইসব সংগঠনকেই বলা হয় গিল্‌ড। গিল্‌ড গঠনের প্রধান উদ্দেশ্যই হল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা।

গিল্‌ডের সভ্যেরা একত্র হয়ে নিজেদের জন্য আচরণ-বিধি তৈরী করতো। সেই আচরণ-বিধিতে থাকতো যে, সভ্যরা ভাল কাঁচামাল দিয়ে একটা নির্দিষ্ট মানের তৈরী জিনিস করবে। প্রতি কারখানায় কতজন শিক্ষানবীশ এবং কতজন শ্রমিক থাকবে তারও উল্লেখ থাকতো। উৎপাদিত জিনিসের দাম কত হবে। তা ছাড়া একজন আর একজনের গ্রাহককে বিভ্রান্ত করবে না, এটাও সবাইকে মেনে চলতে হত।

আচরণ-বিধি

গিল্‌ডের নিয়ম অবহেলা করলে অপরাধীকে শাস্তিভোগ করতে হত। কোনও দোকানদার ভেজাল জিনিস বিক্রী করলে এবং রবিবার বা পর্বদিনে কিংবা রাত্রিকালে কাজ করলে গিল্‌ড তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করত।

গিল্‌ডের প্রধানকে সভ্যগণ নির্বাচন করতো। প্রধানের কাজ ছিল, আচরণ-বিধি যেন সবাই মেনে চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। বিধি-ভঙ্গকারীকে কঠোর শাস্তি দেবার অধিকারও তাঁর ছিল। গিল্‌ডের সভ্য নয় এমন কাউকে শহরে থাকতে দেওয়া হত না। ফলে বাইরের থেকে কেউ এসে ঐ জায়গায় জুড়ে বসবে এমন সুযোগ ছিল না। গিল্‌ডের উদ্যোগে নানা আনন্দ অনুষ্ঠানও হত। তাছাড়া গিল্‌ডের তহবিল থেকে দুঃস্থ অক্ষম সভ্যকে সাহায্যও করা হত। শহরের শান্তি রক্ষাতেও গিল্‌ডকে সহায়তা করতে হত। প্রয়োজন হলে গিল্‌ডের সদস্যরা সংঘবদ্ধভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইও করতো।

গিল্‌ড-পরিচালনা

অস্বীকার করার উপায় নেই, দীর্ঘকাল গিল্‌ড বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু যত বেশী কারিগরের সংখ্যা বাড়তে লাগলো তত বেশী গিল্‌ডের কাজ কষ্টকর হয়ে উঠলো। তখন তারা কারিগরের সংখ্যা কমাতে, কারিগরী বৃত্তিকেই পূরুষানুক্রমিক করে ফেললো। এই ব্যবস্থার ফলে সাধারণ কোন শ্রমিক প্রায় কখনোই একজন পূর্ণ

শিল্পে বাধাদান

কারিগরের মর্যাদা পেত না। এমন কি কারখানার সম্প্রসারণেও গিল্ড বাধা দিতে আরম্ভ করলো। উৎপাদনের সুবিধের জন্য নতুন কোন যন্ত্র আবিষ্কারকে তারা পছন্দ করতো না। যন্ত্রের আবিষ্কারক-কেও তারা কঠোর শাস্তি দিত। ফলে যে গিল্ড প্রথম দিকে শিল্পোদ্যোগে বিশেষ সাহায্য করেছিল, তারাই পরবর্তীকালে শিল্পের অগ্রগতিতে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কেননা শিল্প বাড়াতে গেলেই তাদের সীমাবদ্ধ স্বার্থ বিপন্ন হত।

॥ শহর গড়ার লড়াই ॥

সে-সময় যে-সব স্থানে শহর গড়ে উঠেছিল, সেই স্থানগুলোও কোন না কোন ফিউড্যাল লর্ডের। প্রথমে শহরবাসিগণ লর্ডদের কর দিত। বিনিময়ে তারা শহর গড়ে তুলতো। কিন্তু শহর যতই সমৃদ্ধ হত, তত বেশী করের বোঝা বেড়ে যেত। তা ছাড়া নানা অজুহাতে নানা রকম অতিরিক্ত করও নেওয়া হত। শহরবাসীর পক্ষে এমন অবস্থা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই লড়াই করে লর্ডদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলো। আরম্ভ হল দীর্ঘকালব্যাপী লড়াই। একারণেই সে-সময় শহরগুলোর সুরক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি শহর যেন ছিল এক-একটি দুর্গ। এমন ছিল শহর রক্ষার ব্যবস্থা। শেষ পর্যন্ত শহরগুলো নিজেদের লর্ডদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল। কারণ, তখন শহরগুলোকে বলা হত মানুষের মুক্তির স্থান। যদি কোন সার্ফ পালিয়ে এসে শহরে লুকিয়ে এক বৎসর একদিন থাকতে পারতো, তাহলে তাকে মুক্ত মানুষ বলে ঘোষণা করা হত। পরে ধর্মযুদ্ধের সূত্রে পূর্ব দেশগুলোর সঙ্গে পরিচয় হবার ফলে শহরগুলো আরও দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে, তাদের সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সুসজ্জিত করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা

লর্ডদের সঙ্গে বিরোধ

ধর্মযুদ্ধের প্রভাব

হতে থাকে। পূর্ব দেশগুলোর চমৎকার শহরগুলো পশ্চিমের দেশগুলোকে নিশ্চয়ই এ কাজে উৎসাহিত করেছিল।

তাছাড়া ধর্মযুদ্ধের ফলে পূর্বদেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের সুযোগও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। একদিকে এই নতুন বাণিজ্যের সম্ভাবনা যেমন নতুন নতুন শহর গড়তে উৎসাহ যুগিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে নতুন বাণিজ্যই শহরগুলোর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছিল।

॥ শহরের জীবনযাত্রা ॥

লোকসংখ্যা

আজকের মত তখনকার দিনের শহরগুলোর লোকসংখ্যা বেশী ছিল না। সাধারণতঃ পাঁচ/সাত হাজারের মধ্যেই ছিল। অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল, যেমন লণ্ডন বা প্যারিস শহর।

কৃষিকাজ

শহরবাসী প্রধানতঃ শিল্পকার্যে ব্যস্ত থাকলেও তারা কৃষিকাজ একেবারে বর্জন করে নি। তারা নানা রকম ফলের এবং তরি-তরকারীর চাষ করতো। আবার পশুচারণ ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য তারা কিছু জমি আলাদা করে রাখতো।

গঠন

শহরে ছিল সত্যি খুব জায়গার অভাব। নিরাপত্তার স্বার্থে তারা ছোট এলাকার চারদিকে শক্ত প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতো। ফলে, প্রাচীরের ভেতরে খুব বেশী জায়গা থাকতো না। তাই জায়গার অভাব মেটাতে তারা দোতলা-তেতলা বাড়ী তৈরী করতো। রাস্তাগুলো ছিল খুবই সরু। বর্ষাকালে জল-কাদায় একটা বিশ্রী পরিবেশ তৈরী হত ফলে নানা সংক্রামক রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিত। তাতে লোকও মারা যেত কম নয়।

মধ্যযুগের শহর

বাজারই ছিল শহরের একটিমাত্র মুক্ত এলাকা। সাধারণতঃ শহরের প্রধান গির্জার পাশেই বাজার বসতো। পাশেই থাকতো টাউন হল, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভাও ছিল। টাউন হলে থাকতো একটা সুউচ্চ স্তম্ভ। এই

স্তম্ভে থাকতো একটা দেওয়াল ঘড়ি। শহরের অধিকাংশ বাড়ীই ছিল কাঠের তৈরী। ফলে, আগুন লাগার ঘটনা ঘটতো প্রায়ই। অবশ্য ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীগুলো ছিল পাথরের তৈরী। তাদের পোষাকে ছিল যথেষ্ট জাঁকজমক। তাদের মেয়েরা পরতো নানা রকমের অলংকার। কিন্তু সাধারণ মেয়েদের অলংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

ধনীদের অবস্থা

শহরে ব্যবসায়ীদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। নানা দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে তাদের হাতে প্রচুর টাকা-পয়সা আসত। কাজেই তাদের ক্ষমতা বেড়ে গেল। শহরগুলো থেকে রাজা অথবা জমিদার খাজনা পেতেন। যুদ্ধ বা অন্য কারণে টাকার দরকার হলে শহরের কর্তাদের কাছে বেশি পরিমাণে তা চাওয়া হত। শহরের কর্তারা অম্লানবদনে সে টাকা দিয়ে তার বদলে রাজা-জমিদারের কাছ থেকে প্রচুর সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিত। এরূপ অধিকার পত্রের নাম 'চার্টার' বা সনদ। ফলে কোন কোন শহর অনেক বিষয়ে প্রায় স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন শহরে নিজেদের টাকশাল পর্যন্তও ছিল।

শহরে ব্যবসায়ী সমাজ

সেকালে শহরগুলোতে আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। যাদুকরের খেলা, কুকুরের দৌড়, মোরগের লড়াই, নানারূপ অভিনয় ইত্যাদি লেগেই থাকত। শহরের লোকেরা শুধু নয়, গ্রামের লোকেরাও এসব দেখবার জন্য শহরে ভিড় করতো।

আমোদ-প্রমোদ

কিন্তু শহরে গরীবদের সংখ্যাই ছিল বেশী। তারা ধনী ব্যবসায়ী বা কারিগরদের অধীনে কাজ করতো। কাজ থাকলে তারা পেটপুরে খেতে পেত, নতুবা দিন কাটতো অনাহারে। প্রায় নিয়মিত মহামারী এবং যুদ্ধের ফলে শহরে ছিল অনেক অক্ষম বিকলাঙ্গ মানুষ। এদের ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না।

গরীবদের অবস্থা

॥ শহর পরিচালন ব্যবস্থা ॥

রাজা বা লর্ডদের কাছ থেকে সনদ বা অধিকার পত্র দ্বারা শহরগুলো স্বশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। স্বশাসন বলতে বোঝায় প্রতিটি শহর নিজ নিজ এলাকার সুশাসনের স্বার্থে নিজেরাই প্রয়োজনমত আইন রচনা করতে পারতো, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধের জন্য মুদ্রা তৈরী করবার অধিকারও তাদের ছিল। শহরের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৌর সংস্থা গঠন করা হত। সাধারণতঃ যাঁরা ধনী তারাই এই সংস্থার সদস্য হতেন। এই সংস্থা শহরের তহবিল, রক্ষী-বাহিনী এবং শিল্প-বাণিজ্য ব্যবস্থাবলীর তদারক করতো। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এই সংস্থার প্রধানকে বলা হত **মেয়র**। তাঁর খুব ক্ষমতা ছিল এবং তিনি থাকতেনও খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। মেয়রের সঙ্গে কয়েকজন কর্মচারী থাকতেন, তাঁদের বলা হত **অল্ডারম্যান**। এঁরা শান্তি রক্ষা ও শাসনের কাজে মেয়রকে সাহায্য করতেন।

॥ শহর সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া ॥

শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থেই মানুষ একদা শহর গড়ে তুলেছিল। আবার শহর সৃষ্টির ফলেও শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব হল। আর যত বেশী শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারিত হল তত বেশী আর্থিক সচ্ছলতা দেখা গেল শহরগুলোতে। কিন্তু আগে যেমন সচ্ছলতা ছিল কেবল ফিউড্যাল লর্ডদের একক ভোগাধিকার, এখন সেই সচ্ছলতা লর্ডদের বাদ দিয়ে এক নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করলো। এরা হল ব্যবসায়ী এবং কলকারখানার মালিক। শহর সৃষ্টির এই হল সামাজিক প্রতিক্রিয়া। এই নতুন শ্রেণীকেই বলা হয়েছে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই নতুন সম্প্রদায় সর্বদাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে সজাগ ছিল। শহর শাসনের জন্য তারা এমনভাবে আইন-কানুন রচনা করতো যেন শিল্প-বাণিজ্য থেকে তাদের লাভ ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। এইভাবে প্রাচীন জমিদারদের জায়গায় এখন এক নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে বিধ্বস্ত শহরগুলোকে নতুনভাবে গড়ে তোলা হয় শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে। এই শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতি শহরগুলোকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। আর এই সমৃদ্ধি কেন্দ্রীভূত হয় এক নতুন ধনিক সম্প্রদায়ের হাতে, যারা ব্যবসায়ী বা কলকারখানার মালিক, যাদের বলা হল বুর্জোয়া শ্রেণী।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। শহর সৃষ্টির তাগিদ মানুষের মনে এল কেন? শহর সৃষ্টির ফলে সার্ফদের কি সুবিধে হয়েছিল?

২। গিল্‌ড বলতে কি বোঝায়? গিল্‌ডকে কি কি কাজ করতে হত?

৩। শহরের জীবনযাপন প্রণালীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। শহর শাসনের দায়িত্ব থাকতো কাদের উপর? তাঁরা কি কি বিষয় তদারক করতেন? শহরের প্রধান শাসককে কি বলা হত?

৫। বুর্জোয়া বলতে কি বোঝায়? বুর্জোয়া-সৃষ্টি হল কিভাবে? বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। গিল্‌ড গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল কেন?

২। গিল্‌ড শিল্প-কারখানার সম্প্রসারণে বাধা দিত কেন?

৩। শহরকে মানুষের মুক্তির স্থান বলা হত কেন?

৪। ধর্মযুদ্ধ শহর সৃষ্টিতে কিভাবে সাহায্য করেছিল?

৫। শহরের সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল কেন?

৬। শহরের ব্যবসায়ীদের বিশেষ মর্যাদা দিল কেন?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। পরপৃষ্ঠার প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রতিটি প্রশ্নের পাশে বন্ধনীর ভেতর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের কর।

(অ) শহরের প্রধানকে কি বলা হত? (গিল্ড, অলডারম্যান, মেয়র)।

(আ) শহর শাসনের জন্য রাজা বা লর্ড কি দিতেন? (স্বশাসন, অধিকার-পত্র, বাণিজ্যকেন্দ্র)।

(ই) শহরের একমাত্র মুক্ত এলাকা ছিল কোনটি? (গির্জা, মিউনিসিপ্যালিটি, বাজার)।

(ঈ) শহরে দোতলা-তেতলা বাড়ি তৈরী হত কেন? (জায়গার অভাবে, নিরাপত্তার জন্য, আরামের জন্য)।

২। নীচের বাক্যগুলোর ভুল সংশোধন কর:—

(অ) শহরের লোকেরা কৃষিকাজ একেবারে বর্জন করেছিল।

(আ) শহরের সাধারণ মেয়েরাও অলংকার ব্যবহার করতো।

(ই) রাজাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই শহরবাসীকে দীর্ঘদিন লড়াই করতে হয়েছিল।

(ঈ) গিল্ডই শিল্পের অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

(উ) গিল্ডের সভ্য না হলেও শহরে বাস করা যেত।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন:—

১। নদীর পাশে শহর গড়ে উঠতো কেন?

২। গিল্ডের প্রধানকে কে নির্বাচন করতো?

৩। বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক হওয়ার ফল কি হল?

৪। সার্ফ পালিয়ে এসে কতদিন লুকিয়ে থাকলে মুক্ত মানুষ হতে পারতো?

৫। শহরে প্রায়ই আগুন লাগার ঘটনা ঘটতো কেন?

(ঙ) কর্ম শিক্ষার নির্দেশনা:—

(১) তুমি যে শহরে বাস কর সেই শহরের গোড়া পত্তন হল কিভাবে, সেখানে কোন শিল্পকেন্দ্র আছে কিনা, শহর শাসন করা হয় কিভাবে, শহরে বাস করার কি কি সুবিধে ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করে একটি বিবরণ লেখ।

মধ্যযুগে দূরপ্রাচ্য

বিষয়-সংকেত : যেমন পৃথিবীর সর্বত্র একই সঙ্গে দিন-রাত্রি আসে না, তেমনি সভ্যতার অগ্রগতিও সর্বত্র সমান হয় না। কোন কোন সময় এক অঞ্চল যায় এগিয়ে। তাকে ধরবার জন্য পিছনে পড়ে থাকা অঞ্চল ছুটতে থাকে। এ ভাবেই এগিয়ে চলে মানুষের সভ্যতা। এশিয়া মহাদেশের পূর্বাংশ—যাকে বলা হয় দূরপ্রাচ্য—এই এগিয়ে চলারই এক মনোরম উদাহরণ।

॥ মধ্যযুগে চীন ॥

ষষ্ঠ শ্রেণীতে চীনের প্রাচীন যুগের কথা আমরা পড়েছি। হান রাজত্বের অবসানের পর প্রায় সাড়ে তিনশো বছর চীনের ইতিহাসে চলে অরাজকতার যুগ। সে-সময় দেশে কোন শক্তিশালী রাজা ছিল না বলে ছোট ছোট অনেক রাজ্য গড়ে ওঠে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে চীন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে চীনের সিংহাসনে বসেন সুই বংশের এক সম্রাট। সুই বংশের সম্রাটরা ভাল প্রশাসক ছিলেন। তাঁরা চীনের একতা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ চলতে থাকে। তাতার নামে এক নিষ্ঠুর জাতি পশ্চিম চীনে নতুন করে অভিযান চালায়। সুই সম্রাট তাতার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাঁর সেনাপতি লি-উয়ানকে পাঠালেন। লি-উয়ান তাতারদের দেশ থেকে না তাড়িয়ে তাদের সহযোগিতায় রাজধানী চাঙ-আন অধিকার করলেন। ফলে সুই সম্রাট পদত্যাগ করলেন এবং সেনাপতি লি-উয়ান তখন তাই-সু সুঙ নাম নিয়ে চীনের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর বংশকে বলা হয় তাঙ বংশ। তাঙ বংশের রাজারা (৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ) প্রায় তিনশো বছর রাজত্ব করেন।

॥ তাঙ বংশ ॥

তাঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাই-সু-সুঙ খুব শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন।

চীনের বিশৃঙ্খলা দূর করে তিনি এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তবে তিনি বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। পারিপার্শ্বিক চাপে তিনি সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হন এবং তাঁর পর তাঁর পুত্র মি-মিন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মি-মিন তাইচুঙ নাম গ্রহণ করে সম্রাট হন। তাঙ বংশের তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট।

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট

সম্রাট হয়ে তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দেন। তাতার আক্রমণে চীন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। তিনি এই মঙ্গোলীয় শক্তিকে পরাভূত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। এমন কি মঙ্গোলীয়ার এক অংশ নিজ দখলে আনেন। পশ্চিম দিক থেকেও মঙ্গোলীয়দের তাড়িয়ে উরাল হ্রদ পর্যন্ত তাঁর শাসনে আনেন। তখন থেকে চীনের 'সিল্কওয়ে' অর্থাৎ রেশম পথ মুক্ত হয় এবং এই পথ বিদেশের সঙ্গে পুনরায় বাণিজ্য-পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। তিনি কোরিয়া, তিব্বত জয় করে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে।

রাজ্যবিস্তার

সম্রাট তাই সুঙের আমলে চীন সব দিক দিয়ে উন্নতি করে। তাই তাঁকে 'মহান সম্রাট' বলা হয়। দেশের আইন-কানুন তিনি সংস্কার করেন। দেশের আইনগুলি সংকলন করে সারা দেশে একই ধরনের আইন প্রচলন করেন। সরকারী কর্মচারী নিয়োগে তিনি প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য রাজধানীতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ফলে রাজধানী চাঙ-আন উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি চাষীদের জমির মালিকানা স্বত্ব দেন। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা করেন। সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে রাজধানীর অদূরে এক নতুন শহর গড়ে তোলেন। এই শহরের নির্মাণ কৌশল ও কারুকার্য সে-যুগে সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় অনুকরণীয় ছিল। বলা যায় জাপানের টোকিও শহর পর্যন্ত এই শহরের অনুকরণে তৈরী হয়েছিল।

শাসন

॥ তাঙ সম্রাটদের অবদান ॥

তাঙ বংশের অনেক জ্ঞানী-গুণী সম্রাট রাজত্ব করায় তাঁদের সময়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁরা দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারে মন দেন। বহু কবি, চিত্রকর, সাহিত্যিক তাঁদের রাজ্যে শোভা বর্ধন করতেন। তাঁদের আমলে হানলিন নামে এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। চীনের ইতিহাস রচনা করার জন্য এবং আইন-কানুন তৈরী করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতি

কাব্য-সাহিত্যের জন্য তাঙ যুগ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন লি-পো। তিনি ছিলেন একজন ভাবুক কবি। শোনা যায় জলে চাঁদকে ধরতে গিয়ে তিনি জলে ডুবে প্রাণ হারান।

কাব্য-সাহিত্য

তাঙ যুগে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব ছিল না। চীনের বণিকরা সমুদ্রজলে পাল তুলে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। বাণিজ্য বস্তুর মধ্যে ছিল—চা, চাল, রেশম, মশলা ইত্যাদি। তা ছাড়া চিনে মাটি বা পোর্সিলেনের বাসন-পত্র তারা তৈরী করতো। আর এই বাসনপত্র খুব জনপ্রিয়ও ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

এই যুগেই চীনের লোক পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম চা পাতা থেকে চা-পানীয় তৈরী করে খেতে শুরু করে। কাগজ ও বারুদের ব্যবহার এযুগেই শুরু হয়। এসময় রেশম শিল্প, গালা শিল্প, ব্রোঞ্জের কাজেও চীনদেশ দক্ষতা অর্জন করে।

শিল্প

চিত্রশিল্পের জন্য তাঙ যুগ বিশেষ প্রসিদ্ধ। নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর চিত্র এসময় আঁকা হত। শ্রেষ্ঠ শিল্পী য়ু-তাঙ-ইয়ং এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এযুগের বহু চিত্র পরবর্তীকালে সহস্রবুদ্ধ গুম্ফা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার তাঙ যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। এই যন্ত্রে চীনদেশে প্রথম পুস্তক ছাপা হয়। এর আগে পৃথিবীর কোথাও ছাপার কাজ হয় নি। তখন কাঠের ওপর অক্ষর

খোদাই করে ব্লক তৈরী করে বই ছাপা হত। লম্বা কাগজে এজাতীয় বই ছাপা হত বলে বই গুটিয়ে রাখা যেত। সহস্রবুদ্ধ গুম্ফা থেকে এজাতীয় পুস্তক স্যার অরেল স্টাইন উদ্ধার করেছেন। অনেকে অনুমান



তাঙ যুগের মৃৎশিল্প

করেন বৌদ্ধ পণ্ডিতরা তাঁদের গোপনীয় তন্ত্র-মন্ত্র কাঠের উপর খোদাই করে বই-আকারে এভাবে ছেপে রাখতেন।

॥ বৌদ্ধধর্মের প্রসার ॥

এই যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়। হান যুগে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত হয়। তখন থেকে কালে বহু ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী বৌদ্ধধর্ম প্রসার ও প্রচারের জন্য চীনে যেতেন। তিব্বত থেকেও বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে যেতেন। কালক্রমে এই ধর্মে নানা মত ও নানা আদর্শ দেখা যায়। তাই ভালভাবে এই ধর্মকে জানবার জন্য এবং বৌদ্ধধর্মের তীর্থগুলো পরিভ্রমণ করবার জন্য তাঙ যুগে হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণ করেন। ভারত থেকে যাবার সময় তিনি বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বহু পুঁথিপত্র নিয়ে যান। পরে তিনি তা চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। হিউয়েন সাঙ-এর প্রচেষ্টায় চীনের বৌদ্ধধর্মের এইভাবে সংস্কার হয়।

তাঙ যুগের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে যেমন কোরিয়া, জাপান, আনাম প্রভৃতি দেশ চীনের শিক্ষা-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উন্নত হয় এবং তাদের আদর্শে নিজেদের দেশকে গড়ে তোলে।

নবম শতাব্দী থেকেই তাঙ বংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই রাজবংশের অবসান ঘটে (৯০৭ খ্রীঃ)। এক তাঙ রাজার উপপত্নী দেশের সকল শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। ফলে দেশের জমিদারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এই রাজবংশের অবসান ঘটায়।

॥ হিউয়েন সাঙের ভারতে আগমন ও প্রত্যাগমন ॥

বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এই দুই কারণে যুগে যুগে অসংখ্য চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে এসেছেন। এই সব পরিব্রাজকদের মধ্যে একটি বহুখ্যাত নাম হল হিউয়েন সাঙ। তখনকার দিনে চীন থেকে ভারতে আসা ছিল খুবই কঠিন। তাছাড়া চীনের রাজারাও দেশের কাউকে বাইরে যেতে দিতেন না। কিন্তু হিউয়েন সাঙ কোন বাধা না মেনে পালিয়ে তাই সুঙ-এর শাসনকালে গোবি মরুভূমির পথে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। মরুভূমি পার হয়ে তিনি মধ্য এশিয়ার তুরফান শহরে পৌছান। তুরফান থেকে তিনি কুচা শহরে আসেন। তারপর পৌছান তুর্কিস্তানে। তুর্কিস্তানের পর সমরখন্দে, বালখ হয়ে তিনি আসেন আফগানিস্তানের কাবুল উপত্যকায়। তারপর কাশ্মীর হয়ে তিনি ভারতের আর্যাবর্তে আসেন। তিনি যখন ভারতে আসেন তখন হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে রাজত্ব করছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তিনি এদেশে কাটান। এখানে থাকাকালীন তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। অসংখ্য বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির তিনি দেখেছিলেন। এদেশ থেকে যাবার সময় তিনি বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম, সোনা, রূপা ও চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরী ছ'টি বুদ্ধমূর্তি এবং ৬৫৭ খানি

সংস্কৃত ও পালি পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান। তখনও চীনে তাই-সুঙ সম্রাট। তিনি হিউয়েন সাঙ-কে দেশে ফেরার পর বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানান



হিউয়েনসাঙের ভারতে আগমন ও প্রত্যাগমন পথ

এবং তাঁকে মন্ত্রীপদ গ্রহণে অনুরোধ করেন। কিন্তু নির্লোভ হিউয়েন সাঙ এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে তাই সুঙেরই

অনুরোধে হিউয়েন সাঙ এক বৎসরের মধ্যে তাঁর ভারত ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এই বইখানির নাম 'সি-ইউ-কী' এর অর্থ পশ্চিম দেশভ্রমণ। এই বইখানি থেকে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি।

। সুঙ বংশের সূত্রপাত ও অবদান ॥

তাঙ বংশের পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল চীনদেশে চলেছিল এক অনিশ্চিত অবস্থা। তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় সুঙ বংশ। এই বংশ তিনশ' বছরের কিছু বেশী সময় চীনদেশ শাসন করেছিল। এই বংশেরই শেষভাগে দুর্ধর্ষ মঙ্গোল শক্তির উত্থান হয় এবং সুঙ বংশকে ধ্বংস করে চীন দেশ দখল করে।

সুঙ রাজাদের সাম্রাজ্য তাঙ বংশের মত অত বিস্তৃত ছিল না। এমনকি মূল চীনদেশের সমগ্র অঞ্চলের ওপরও তাদের কর্তৃত্ব ছিল না।

কিন্তু তাদের সামরিক শক্তি খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও তাদের সাংস্কৃতিক অবদান বিশেষভাবে মনে রাখার মত। বিশেষ করে বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মধারা বিশেষ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। এই বংশের এক প্রধান মন্ত্রী ওয়াং আন শি'র নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইনি কতকগুলো কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। যেমন, বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের তালিকা, যাকে আমরা বাজেট বলি, তৈরী করা। রাষ্ট্রের পরিচালনায় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা কৃষকদের ফসল বোনার সময় সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা করা। জমি বণ্টনে সমতা এনে তার ভিত্তিতে ভূমি রাজস্ব ধার্য করা। যে কোন ধরনের সম্পত্তির ওপর কর ধার্য করা ইত্যাদি। কিন্তু এই সব কর্মসূচী ভাল হলেও সে সময়ে যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল তা বলা যায় না। বরং এই সব কর্মসূচীর বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল তাই পরে সুঙ বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। তবে এই সব কর্মসূচীর কিছু কিছু বিষয় পরবর্তী

শাসন সংস্কার

কালে পরিবর্তিত আকারে দেশশাসনের নীতির ক্ষেত্রে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করেছিল।

উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণঃ সুঙ বংশের রাজত্বকালে শাসন-ব্যবস্থায় অনেক নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। অনবরত যুদ্ধের ফলে দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে চাষীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তারা সকলেই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করত। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তারা উচ্চ হারে সুদ দেবার প্রতিশ্রুতিতে টাকা ধার করত। এত উচ্চহারে সুদ দিতে গিয়ে তারা জীবন ভোর ধারের টাকা পরিশোধ করতে পারত না। কৃষকদের এই দুরবস্থা দূর করবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হন ওয়াং-আন-সি। ওয়াং-আন-সি ছিলেন বাস্তববাদী। তাঁর মতে দেশের জনগণের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকারের। দেশের সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকা কর্তব্য। তাই তিনি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। চাষীদের শস্যবীজ সরবরাহ করার এবং ন্যায্য দামে চাষীদের উৎপন্ন ফসল কেনবার ব্যবস্থা করেন। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলেও ন্যায্য দামে চাষীরা যাতে জিনিসপত্র পায় তার ব্যবস্থা তিনি করেন। তিনি ধনী লোকদের ওপর কর বসিয়ে সরকারী ব্যয় মেটাবার চেষ্টা করেন। দেশের প্রতি পরিবার হতে একজন লোককে তিনি শান্তি বাহিনীতে যোগদান আবশ্যিক করেন। এই বাহিনী দেশের শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিত। এই বাহিনীর নাম 'পাঙ্ক-চাঙ'। বিনা পারিশ্রমিকে লোক খাটাবার ব্যবস্থা তিনি রদ করেন। মজুরদের টাকা পয়সায় পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা, এমনকি সরকারী কর্মচারীরাও তাঁর এ ব্যবস্থাকে ভাল চোখে না দেখায় তাঁর এই ব্যবস্থাপনা সফল হতে পারেনি। আবার তখনকার দিনের সাধারণ মানুষও এত সব পরিবর্তনের তাৎপর্য না বুঝতে পেরে বিরোধিতা করেছিল।

তা ছাড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সুঙ বংশ বিশেষ স্মরণীয়। এ সময়ে রচিত বহু কবিতা চীনে বিশেষ জনপ্রিয়। প্রাচীন নানা রচনাবলীর সংকলনও এ সময় রচিত হয়েছিল। ইতিহাস রচনায় এই বংশের অবদান ভোলবার নয়। এই সময়ে রচিত ইতিহাস পরবর্তীকালে ইতিহাস রচনায় বিশেষ সাহায্য করেছিল। তা ছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল।

সাহিত্য-সংস্কৃতি

যাই হোক শেষ পর্যন্ত মোঙ্গল জাতির আক্রমণে সুঙ বংশের অবসান ঘটে।

॥ য়ুয়ান যুগ ॥

চীনের উত্তরে মঙ্গোলিয়া। এখানেই তাতার নামে এক যাযাবর জাতির বাস। এদের য়ুয়ান বলত। এই তাতার জাতি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে মঙ্গোল নামে এক উপজাতি। মঙ্গোলেরা ছিল যেমন যোদ্ধা তেমনি নিষ্ঠুর। এদের এক দুর্ধর্ষ নেতা হলেন চেঙ্গিস খান। ইনি সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিলেন। সুঙ শাসনকালে চেঙ্গিস চীনদেশ আক্রমণ করে পিকিং দখল করেন। ক্রমশঃ সমগ্র উত্তর চীন তাঁর পদানত হয়। তাঁর রাজধানী ছিল কারাকোরামে।

মঙ্গোলদের পরিচয়

চেঙ্গিস

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর মঙ্গোল সর্দার হলেন তাঁর পুত্র ওগদাই খান। ওগদাই পিতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেন; তিনি প্রায় সমগ্র সুঙ সাম্রাজ্য দখল করে নেন।

ওগদাই

ওগদাই খানের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মংগু খানের শাসনকালে চীন দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন মংগু খানের ভাই কুবলাই খান। পরে মংগু খানের মৃত্যুর পর কুবলাই খান সিংহাসনে বসেন।

মংগু

॥ **কুবলাই খান** ।

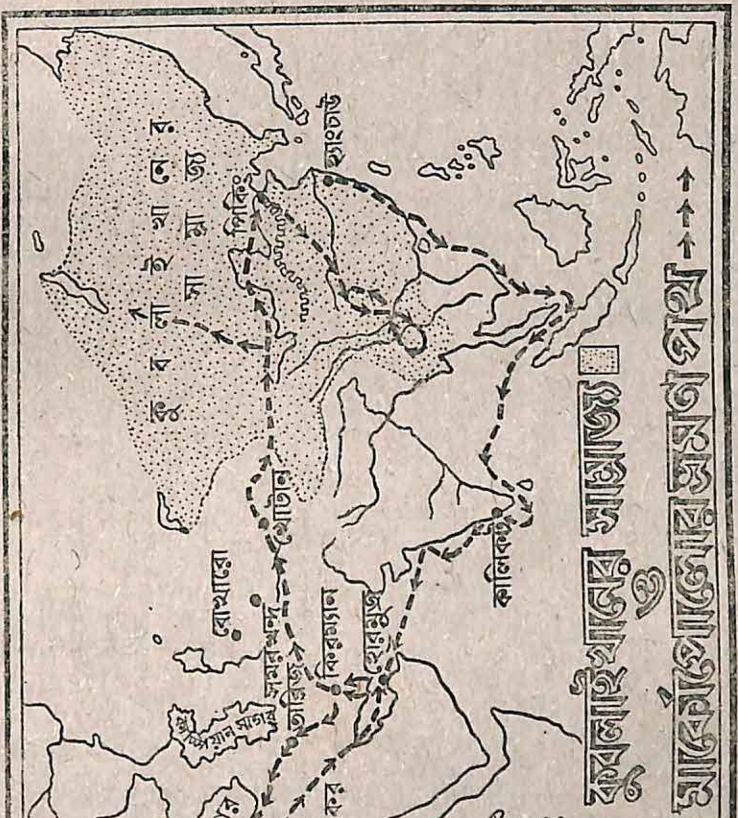
কুবলাই খান সিংহাসনে বসে মঙ্গোলিয়ার কারাকোরাম থেকে রাজধানী চীন দেশের পিকিং-এ সরিয়ে আনেন এবং চীন দেশ থেকেই সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং চীনবাসীও তাঁকে জাতীয় সম্রাট বলে গ্রহণ করেছিল। কারণ কুবলাই খানের উদ্যোগে মোঙ্গল প্রথার সঙ্গে চীন দেশের শাসন পদ্ধতির এক চমৎকার সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছিল। তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে দেশে শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নতুন রাজধানী পিকিংকে তিনি এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যেই পিকিং একটি বিখ্যাত শহরে পরিণত হয়। তাছাড়া নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন যথেষ্ট উদার। অস্বীকার করার উপায় নেই, মূলতঃ কুবলাই খানের নেতৃত্বেই যাযাবর মঙ্গোল জাতি নানা দেশ ও মানুষের সঙ্গে সংযোগের ফলে এক সভ্য জাতি হিসাবে গড়ে ওঠে। তিনিই হলেন য়ুয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশ চীন দেশ শাসন করেছিল একশ বছরেরও বেশী।



কুবলাই খান

যাই হোক ইউরোপে ও এশিয়া উভয় মহাদেশে মঙ্গোল সাম্রাজ্য বিস্তৃত থাকার ফলে দুই মহাদেশের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নানা জ্ঞানী-গুণী জনের নিত্য সমাগমে মঙ্গোল সাম্রাজ্য তখন জমজমাট। কুবলাই খানের শাসনকালের নানা তথ্য আমরা

জানতে পারি মার্কোপোলো নামে ভেনিসের এক পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনী থেকে।



॥ মার্কোপোলোর বিবরণ ॥

কুবলাই খানের অনুরোধে ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন খ্রীষ্টান যাজকের

সঙ্গে সতেরো বছরের মার্কোপোলো চীন দেশে গিয়েছিলেন। তিনি ইটালির ভেনিস শহরের লোক ছিলেন। মার্কোপোলো ভেনিস শহর থেকে জাহাজে চেপে সিরিয়া আসেন। সিরিয়া থেকে হাঁটা পথে দামাস্কাস, দামাস্কাস থেকে পারস্যের মধ্য দিয়ে তিনি আফগানিস্তানে পৌছান। সেখান থেকে মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ, বালখ প্রভৃতি অঞ্চল দিয়ে তুর্কিস্তান পার হয়ে গোবি মরুভূমিতে পৌছান। গোবি মরুভূমি পার হয়ে তিনি চীন দেশে আসেন। চীনের তৎকালীন সম্রাট কুবলাই খান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। মার্কোপোলো চীন ভাষা শিখে ছিলেন। কুবলাই খান তাঁকে হ্যাং-চাউ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং পোলো প্রায় ষোল বৎসর চীনদেশে কাটান। অবশেষে তিনি চীনদেশ পরিত্যাগ করে নিজ দেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। ষোল খানি জাহাজে নানা মালপত্র বোঝাই করে তিনি চীনের বন্দর ত্যাগ করেন। জাভা, সুমিত্রা হয়ে তিনি ভারত মহাসাগরের উপকূল ধরে চলতে থাকেন। পথে ভারতের মালাবার উপকূলে মাদ্রাজ শহরে তিনি একবার যাত্রা বিরতি করেন। তৎপরে পুনরায় যাত্রা করে তিনি পারস্য দেশে পৌছান। পারস্য দেশ থেকে হাঁটাপথে কনস্টানটিনোপল হয়ে অবশেষে তিনি নিজ দেশে এসে পৌঁছান।



মার্কোপোলো

কিন্তু বহুদিন পরে দেশে ফেরাতে অনেকেই মার্কোপোলোকে চিনতে পারেনি। এমন কি তিনি যে সত্যিই চীন দেশে গিয়েছিলেন সেকথাও কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি চীন

থেকে যেসব ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিলেন তা দেখালে সবাই তখন তাঁর কথা বিশ্বাস করে।

মার্কোপোলোর বিবরণী কিন্তু রচিত হয়েছিল অদ্ভূতভাবে। একবার তাঁর দেশ ভেনিসের সঙ্গে ইটালির আর এক শহর জেনোয়ার যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে মার্কোপোলো বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর অন্যান্য সহ-বন্দীদের তিনি বলতেন। এক বন্দী সেই সব বিবরণ লিখে রাখতেন। এ ভাবেই রচিত হয় মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিনী।

পোলোর অভিমত হল, পিকিং-এর মত সুন্দর শহর তখন আর ছিল না বললেই হয়। চওড়া রাস্তাঘাট, সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, চমৎকার সব উদ্যান। হ্যাং চাউ নগরটি ছিল আরও সুন্দর। সারা শহরে এত খাল ছিল যে এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় যেতে সেতু পেরুতে হয়। সেতুগুলোও ছিল এত উঁচু যে নিচ দিয়ে জাহাজ যেতে পারত।

নগরের অবস্থা

পোলো বলেছেন, কুবলাই ছিলেন খুবই সুপুরুষ। তাঁর সিংহাসনের পাশে এক প্রকাণ্ড সিংহ বসে থাকতো। প্রত্যহ কত যে হাতী, ঘোড়া, উট উপহার আসতো তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে সম্রাট ভোজসভার ব্যবস্থা করতেন। তাতে উপস্থিত থাকতো প্রায় চল্লিশ হাজার লোক।

রাজসভা

পোলো আরও বলেছেন, চীনবাসী কয়লার মত এক ধরনের কালো পাথর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতো। দেশে কাগজের টাকা চালু ছিল। দুর্ভিক্ষ হলে প্রজাদের কর দিতে হত না। সারাদেশে ছিল অসংখ্য সরাইখানা, দ্রাক্ষা বাগান, বৌদ্ধ মঠ। পথের দুপাশে সুন্দর সাজানো দোকান। পাওয়াও যেত নানা রকমারী জিনিস। সোনালী কাজকরা রেশম বস্ত্র পরে সাধারণ মানুষ ঘুরে বেড়াতো। কেবল হ্যাং-চাই শহরেরই স্নানাগারের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার।

সাধারণ অবস্থা

চীন দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের কথাও মার্কোপোলো তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন।

॥ জাপান দেশ ॥

জাপান দেশটি চীনের পূর্বদিকে অবস্থিত। এটি দ্বীপময় দেশ। তার পশ্চিম পাশেই আছে কোরিয়া দেশ। তাই কোরিয়া আর চীনের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ সেই প্রাচীন কাল থেকেই বেশী।

জাপান দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জাপানীদের মধ্যে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তী অনুসারে জাপানীরা সূর্যবংশের সন্তান। জাপানের সম্রাট সূর্য দেবের পৌত্র। আর এক সূর্যদেবের পুত্র কোরিয়ার সম্রাট। এই বিশ্বাসে জাপানীদের সঙ্গে কোরিয়ানদের সম্পর্ক অতিনিকট।

জাপানের মানুষ নিজেদের দেশকে বলে নিপ্পন। নিপ্পন নাম দিয়ে ছিলেন চীনের সম্রাট। এই কথার অর্থ হল 'সূর্যোদয়ের দেশ'। চীনারা জাপান দেশকে বলত তাই-নিয়-পুঙ। এই নাম থেকেই 'নিপ্পন' নামটি আসে। জাপান নামকরণ মার্কোপোলোর দেওয়া নাম চিপাংগু থেকে এসেছে। নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে জাপনীরা হল মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ।

॥ মধ্যযুগে সমাজব্যবস্থা ॥

জাপান মধ্যযুগেও ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। দেশটি কতকগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলো প্রায় স্বাধীন ছিল। কতকগুলো পরিবার বা গোষ্ঠীর লোক এক একটি প্রদেশ শাসন করত। সম্রাট নিজেও ছিলেন এমন এক গোষ্ঠীর 'দলপতি। জাপানের সম্রাটের পদবী হল মিকাডো। ক্ষমতালাভের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলত অনবরত। প্রকৃতপক্ষে জাপানের এই সময়ের ইতিহাস পারিবারিক কলহের ইতিহাস।

দ্বাদশ শতাব্দীতে জাপানে এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধ চলে প্রায় দুশো বছর। জাপানের এই যুদ্ধ চন্দ্রমল্লিকা বা ক্রিসেন্থ-মাসের যুদ্ধ নামে পরিচিত কারণ চন্দ্রমল্লিকা ফুল ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিহ্ন। জাপানের সম্রাটও এই যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। পশ্চিম দেশের সংস্পর্শে আসার আগে জপোনের সামাজিক অবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। দেশের শাসন ক্ষমতা ছিল তখন কয়েকটি পরিবারের ওপর। দেশের সমস্ত জমির মালিকও ছিলেন তাঁরা। সে সময় সমাজে তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়—(১) সম্ভ্রান্ত, (২) সামুরাই ও (৩) সাধারণ।

জাপানের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে বলা হয় সামুরাই প্রথা। সামুরাই-রা ছিল সৈনিক। এই প্রথায় সর্বোচ্চ স্থানে থাকত সোগান। তার নীচের শ্রেণীকে বলা হত দাইমিও এবং সব শেষে নীচের তলায় থাকত সামুরাই।

সামন্ততান্ত্রিক প্রথা



সামুরাই

জাপানের কৃষকদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। তাদের কাছ থেকে মোটা হারে কর আদায় করা হত। দেশে লেগে থাকত অনবরত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হ'ত চাষীদের। যুদ্ধ ছাড়া সামুরাইদের কোন কাজ করতে হত না। এই প্রথা দীর্ঘ দিন ধরে জাপানে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সোগন প্রথার বিলোপ হয়।

দেশে রাজা অবশ্য একজন ছিলেন। রাজাকে জাপানী ভাষায় বলে মিকাডো। কিন্তু সামুরাইদের ক্ষমতা ছিল মিকাডোর চেয়েও

বেশী। এরা সব সময়েই একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করতো। শেষ পর্যন্ত যে সামুরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতো তার পরামর্শ না মেনে চলার কোন উপায় মিকাডোর থাকতো না।

রাজার অবস্থা

সামুরাইদের একটা বিশেষ গুণ হল তারা নিজের দেশের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও পিছিয়ে যেত না। অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তারা পেটে চাকু চালিয়ে হারিকিরি বা আত্মহত্যা করাও ভাল মনে করতো। এই প্রথাকে জাপানী ভাষায় বলা হয় বুশিডো। এই প্রথা হল ইউরোপের নাইট প্রথার মত। সামুরাইদের চলা-ফেরার কতকগুলো নীতি মেনে চলতে হত। এই সব নীতির মধ্যে আনুগত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা হল সবচেয়ে বড় কথা। তারা অপ্রয়োজনীয় কথা কখনো বলতো না। তাদের আচার, আচরণ ছিল শান্ত সমাহিত। এখনো জাপানে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান গভীর নীরবতার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এটা বুশিডো প্রথার প্রভাব।

বুশিডো

জাপানের প্রাচীন ধর্মের নাম হল সিন্তোধর্ম। এই ধর্মে প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষদের পূজা করার প্রথা প্রচলিত। এই ধর্মের ফলেই দেশের লোক সম্রাট বা কর্তৃপক্ষকে সর্বদাই ভক্তি ও সম্মান করার শিক্ষা পেয়েছিল। তাই দেখি সুযোগ পেলেও জাপানের লোক কখনো রাজাকে উচ্ছেদ করার কথা ভাবতে পারে নি।

প্রাচীন ধর্ম সিন্তো

জাপানের নিকট প্রতিবেশী হল কোরিয়া। কোরিয়া থেকে লোক এসে প্রথমে জাপানের কতক অংশে রাজ্য স্থাপন করে। তখন এই অংশকে বলা হত যামাতো। কোরিয়ার মাধ্যমেই চীনের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরে ধীরে ধীরে যামাতো রাজ্যের কর্তৃত্ব সারা দেশে বিস্তৃত হয়।

প্রথম রাজ্য স্থাপন

॥ চীন দেশের প্রভাব ॥

চীন দেশের সঙ্গে জাপানের যোগাযোগের ফল দেশের পক্ষে খুবই উপকারের হয়েছিল। চীনদেশ থেকেই জাপান পেয়েছে লেখার ভাষা। ঐ দেশ থেকেই এসেছে বৌদ্ধধর্ম।

ভাষা ও ধর্ম

শুধু তাই নয়, দেশশাসনের ক্ষেত্রেও চীনের অবদান উল্লেখযোগ্য। চীন দেশের অনুকরণে জাপানেও রাজাকে শক্তিশালী করে তোলার উদ্যোগ আরম্ভ হল। দেশের সমস্ত জমি রাজার কর্তৃত্বে আনার ব্যবস্থা হল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের ক্ষেত্রেও রাজাই প্রধান পুরোহিত বলে গৃহীত হল। এই সব ব্যবস্থার ফলে রাজা বা মিকাডোর অবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী হল। চীনের অনুকরণে নির্মিত হল নতুন নতুন শহর। এর আগে জাপানীরা শহর তৈরী করতে জানতো না। নারাতে গড়ে উঠলো জাপানের প্রথম রাজধানী।

রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি

জাপানের ইতিহাসে শোটোফু-তাই-সি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি সোগা পরিবারের লোক ছিলেন। আর এই সোগা পরিবার জাপানের সবচেয়ে প্রাচীন সামন্ত। শোটোফু-তাই-সি দেশে কর প্রথা সংস্কার, শাসনতন্ত্র সংশোধন এবং জমিবিলির নতুন ব্যবস্থা করে চীনের সম্রাটের মত জাপান সম্রাটকেও ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিত্তবানদের বাধাদানের ফলে তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি। চীনের অনুকরণে জাপানী সভ্যতাকে ও সংস্কৃতিকে গড়তে তিনি সচেষ্ট হন। তাই তিনি জাপানের অনেক ছাত্রকে চীনে পাঠান শিক্ষা নিতে। ফলে চীনের অনুকরণে জাপানের কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা গড়ে ওঠে। জাপানে লিপি ও লেখবার ধারা প্রচলিত হয়। জাপানীরা চীনেদের কাছ থেকে চা খেতে শেখে। চীনামাটির জিনিসপত্র তৈরী করতে শেখে। এইভাবে চীনের অনুকরণে জাপান দেশ গড়ে ওঠে।

শোটোফুর প্রচেষ্টা

॥ রাজধানী নারার গুরুত্ব ॥

নারা স্থাপন

রাজধানী হিসেবেই শুধু নয়, নারা শহরের প্রতিষ্ঠা অন্যান্য দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই বৌদ্ধধর্ম এমন প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে ক্রমশঃ রাজধর্মে পরিণত হয়। ফলে দেশশাসন ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ মঠগুলির প্রভাব ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে।

রাজার ক্ষমতা হ্রাস

যাই হোক শোটোফু নানাভাবে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করলেও রাজা কিন্তু দীর্ঘকাল তাঁর ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলেন না। বিভিন্ন জমিদারগণ তাদের লুপ্ত ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্য আবার নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। এইভাবেই একজন বিখ্যাত জাপানী জমিদার কামাটোরী প্রধান হয়ে ওঠেন এবং ফুজিওয়ারা বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট এক রকম এই বংশের হাতের পুতুল হয়ে যান। রাজার ক্ষমতা কমলেও কামাটোরীর শাসনকালে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পায়।

॥ সোগান যুগ ॥

সোগান ব্যবস্থার উদ্ভব

বহু বছর ফুজিওয়ারা বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারপর দ্বাদশ শতাব্দীতে তাইরা ও মিনামোতো নামে দুই জমিদার বংশের উদ্ভব হয়। মিনামোতো পরিবারে যোরিতোমো নামে এক ব্যক্তি এত শক্তিশালী হয়ে ওঠেন যে তিনি প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসনকর্তা হয়ে ওঠেন। তখন সম্রাট তাঁকে সোগান বা প্রধান সেনাপতি উপাধি দেন।

এরপর থেকেই সোগান উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে দীর্ঘকাল যাবৎ চলতে থাকে। এখন থেকে সোগান-ই হলেন দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। প্রায় সাতশ বৎসর বিভিন্ন বংশের বিখ্যাত সোগানরা দেশ শাসন করতে থাকেন। এই সময় রাজার হাতে প্রকৃত কোন ক্ষমতাই থাকে না।

নারার পর জাপানের দ্বিতীয় রাজধানী হল কিয়াতো। যোরিতোমো কিন্তু কিয়াতোতে না থেকে কামাকুরা নামক এক স্থানে তাঁর শাসন কেন্দ্র স্থাপন করেন। রাজধানীর বাইরে অন্য জায়গা থেকে দেশ শাসন করা হত বলে নতুন ব্যবস্থাকে বলে বাকুফু বা তাঁবুর সরকার। এ কথার তাৎপর্য হল যুদ্ধের সময় যেমন অস্থায়ীভাবে কোন তাঁবু থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়, বর্তমানে জাপানের শাসন পদ্ধতি যেন অনেকটা সেই ধরনের। তাই এই নাম। কামাকুরা সোগানদের -শাসনকালে দেশে শান্তি ও সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কামাকুরা সোগান

কামাকুরা সোগানদের পর উল্লেখযোগ্য সোগান বংশ হল আশিকাগা সোগান বংশ। আশিকাগা সোগানগণ রাজধানীতেই থাকতো। ফলে সামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের যোগাযোগ স্থাপিত হল। তাছাড়া এই সময় চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হয় প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে। জাপানে চিত্রাঙ্কন, কাব্যরচনা, গৃহনির্মাণ, দর্শনচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক চৈনিক প্রভাব এ সময় লক্ষ্য করা যায়। সব চেয়ে বড় কথা হল আশিকাগা সোগানদের আমলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে নতুন নতুন অট্টালিকা নির্মাণের উদ্যোগ আরম্ভ হয়। কিন্তু বিভিন্ন জমিদারগণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রাহ্য করে আবার স্বাধীন হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে থাকে।

আশিকাগা সোগান

তাই আশিকাগা সোগানদের শেষ সময়ে আরম্ভ হয় গৃহবিবাদ। এই বিবাদ চলেছিল একশ বৎসর ধরে। প্রথমে নবুনাগা নামে জমিদার ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী কিয়াতো দখল করেন। তারপর বৌদ্ধ মঠগুলোর কর্তৃত্ব ধ্বংস করে মধ্য জাপানে প্রধান হয়ে ওঠেন। কিন্তু ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিহত হন। তখন তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি হিদেযোশী প্রায় সমগ্র

দীর্ঘস্থায়ী গৃহবিবাদ

জাপান জয় করেন। এমন কি তিনি কোরিয়ার মধ্য দিয়ে চীনদেশ জয় করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সেনাপতি হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের জন্যই তাঁকে জাপানের নেপোলিয়ান বলা হয়।

তোকুগাওয়া সোগান

হিদোযোশীর পর তাঁর এক বিশ্বস্ত সেনাপতি তোকুগাওয়া ইযেযাশু ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। তাঁর শত্রুদের পদানত করার পর তিনি এক নতুন সোগান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের নাম হল তোকুগাওয়া বংশ। ইযেযাশুর লক্ষ্য হল, এমন এক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেন তাঁর বংশের প্রাধান্য অটুট থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই লক্ষ্য পূরণে তিনিও তাঁর বংশধরেরা এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করেন।

জেদো শহর

তোকুগাওয়া বংশের প্রথম সোগান ইযেযাশু রাজধানী কিয়াতোতে না থেকে জেদো বা ইয়েডু নামে এক নতুন শহর নির্মাণ করেন। এই শহরই এখন টোকিও নামে পরিচিত। তখন থেকেই জেদো হয়ে উঠলো দেশের প্রধান শাসন ও সংস্কৃতির কেন্দ্র।

শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা

ইযেযাশু দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত জমিদারদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসেন। দেশে রাজা থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতে কোন ক্ষমতাই রাখা হল না। গুপ্তচর ব্যবস্থাকে বিশেষ ভাবে জোরদার করা হল। বৌদ্ধ মঠগুলোকে আর শক্তি সঞ্চয় করতে দেওয়া হল না। বিদেশীদের ওপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হল। এই সময়ই খ্রীষ্টান মিশনারীগণ জাপানে আসতে থাকে

খ্রীষ্টধর্মের আগমন ও ফলাফল

এবং এই ধর্ম জাপানে বিস্তৃত হতে থাকে। ফলে তোকুগাওয়া সোগানগণ এই নতুন ধর্মের ভেতর যেন দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখতে পেল। তাই তারা জাপানীদের যেমন বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ

করে, তেমনি বিদেশীদেরও জাপানে প্রবেশ বন্ধ করে। ফলে জাপান বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাদের কাটলো প্রায় দু'শ বৎসর।

॥ তোকুগাওয়া শাসনের ফলাফল ॥

যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাপান দু'শ বৎসর কাটিয়েছিল সেই সময়টাতে দেশে সাধারণভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

তারই ফলে গড়ে উঠেছিল অনেক নতুন নতুন শহর। আর যত বেশী শহর গড়ে উঠতে লাগলো তত বেশী ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগে জাপানী সমাজজীবনে গড়ে উঠলো ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের ফলে কৃষিনির্ভর জাপানী অর্থনীতির পরিবর্তন হল। জমিদারগণ পড়লো অসুবিধায়। আবার এই সময়েই দেশে বার বার দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা প্রভৃতির ফলে জনসংখ্যাও বাড়লো না। ফলে ক্ষেতে-খামারে কাজ করার লোকেরও অভাব দেখা দিল। এমনিতেই জাপানী কৃষকেরা করভারে ছিল জর্জরিত। তার সঙ্গে এই সময় নানাস্থানে দেখা গেল কৃষক বিদ্রোহ।

অন্য দিকে যে সামরিক শক্তির সাহায্যে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা এসেছিল, সেই সামরিক বাহিনী বা সামুরাইগণ দীর্ঘকাল অকেজো হয়ে রইলো দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠাব ফলে। আবার দেশের প্রয়োজনে সামুরাইদেরও আগের মত দরকার হল না। ফলে সামুরাইদের দিন কাটতে লাগলো সংকটের মধ্য দিয়ে।

চিন্তা জগতেও এসময় এসেছিল বিরাট পরিবর্তন। তোকুগাওয়া সোগানগণ কখনোই বৌদ্ধ মঠগুলোকে নতুনভাবে গড়ে উঠতে দেয় নি। বরং তারা কনফুসিয়াসের চিন্তাধারায় দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাইলো। এই চিন্তাধারার মূল কথা হল, দেশের সম্রাটের প্রতি অকপট আনুগত্য। তাই যদি হয়, জাপানীরা ভাবতে লাগলো, তাহলে সোগানদের মেনে চলার তো কোন কারণ নেই। কারণ তারা

তো আর রাজা নয়, বরং রাজকর্মচারী। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ক্রমশঃ সোগান-শাসন সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠতে লাগলো।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তোকুগাওয়া সোগানদের শাসনকালে দেশে আপাতদৃষ্টিতে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকলেও এবং এই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জাপানের দরজা বহির্জগতের জন্য বন্ধ করে দিলেও, জাপানে কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছিল। আর পরিবর্তনও এসেছিল সব দিক থেকেই। তারই ফলে শেষ পর্যন্ত দেশে সোগান শাসনের অবসান ঘটিয়ে জাপানে আরম্ভ হয় এক নবযুগ।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

এশিয়া মহাদেশের দুটি উল্লেখযোগ্য দেশ চীন ও জাপান। মধ্যযুগে চীনের তাঙ রাজত্বকালে এমন সব ব্যবস্থাবলী গৃহীত হয়েছিল যা সত্যিই বিস্ময়কর। আবার সুঙ আমলের শাসন-সংস্কার যে কোন বিচারেই একেবারে আধুনিক। পরে মঙ্গোল বীর কুবলাই খানের শাসনকালে চীনে এক নতুন সমন্বয় প্রয়াস চলেছিল।

অন্যদিকে জাপানের মধ্যযুগের ইতিহাস হল রাজাকে সামনে রেখে বিভিন্ন সামন্ত পরিবারের নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতা ভোগের নিরলস প্রয়াসের ইতিহাস।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। ভারতে হর্ষবর্ধনের শাসনকালে চীনদেশে কোন বংশ শাসন করতো? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কি?

২। সুঙ বংশের শাসনকালে চীনদেশে কি কি শাসনতান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা হয়েছিল?

৩। য়ুয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তিনি কোন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

তাঁর সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল? দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তিনি নতুন কোন চেষ্টা করেছিলেন?

৪। মার্কোপোলো কে ছিলেন? তাঁর বিবরণী রচিত হয়েছিল কিভাবে? ঐ বিবরণী থেকে আমরা কি জানতে পারি?

৫। সোগান কি? কে প্রথম সোগান হয়েছিলেন? সোগান শাসনকে কি সরকার বলা হত? কেন বলা হত?

৬। তোকুগাওয়া সোগান বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের সবচেয়ে বড় অবদান কি? কিভাবে এই বংশ দেশে শান্তি স্থাপন করেছিল?

৭। জাপানে সোগান শাসনের অবসান ঘটলো কিভাবে?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

সুঙ বংশের সাহিত্য, মঙ্গোল, হ্যাং চাউ শহর, বুশিডো, সিন্তো বাকুফু।

২। তাঙ যুগে চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার হয় কেন? এই বিস্তারের ফল কি হয়েছিল?

৩। তাঙ যুগে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে গিয়েছিল কেন?

৪। সামুরাই কাদের বলা হয়। এরা কিভাবে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতো?

৫। সিন্তো ধর্মের মূলকথা কি?

৬। আশিকাগা সোগানদের শাসনকালে সবচেয়ে বেশী কিসের বিস্তার ঘটে। তার ফল কি হয়েছিল।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

অ) তাঙ শাসনকালে চীনের বিখ্যাত কবি — জন্মেছিলেন।

আ) তাঙ যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর নাম —।

ই) চীনে প্রথম ছাপাখানার ব্যবহার হয় —।

ঈ) ইতিহাস রচনায় চীনের — বংশের অবদান ভোলবার নয়।

উ) কুবলাই খান —ধর্মগ্রহণ করেছিলেন।

ঊ) জাপানে জমিদারদের বলা হয় —।

ঋ) টোকিও শহরের প্রাচীন নাম —।

ঌ) সোগান — চীনদেশ জয়ের চেষ্টা করেছিলেন।

এ) জেদো শহর নির্মাণ করেন —।

ঐ) — শব্দের অর্থ সূর্যোদয়ের দেশ।

২। নীচের বাক্যগুলো অনুসারে নামগুলো মনে রাখো :—

অ) চীন থেকে এক পর্যটক বাইরে বেরুলেন, আর চীনে আর এক পর্যটক এলেন।

আ) চীনের একজন কবি আর একজন চিত্রশিল্পী।

ই) অপমান হলে পেটে চাকু চালিয়ে মৃত্যুর জাপানী নাম।

ঈ) জাপানে গৃহযুদ্ধের নাম।

উ) চীনের একজন শাসন সংস্কারক, যাঁর সংস্কার দেখে আজকের দিনের কথা মনে হয়।

ঊ) ইউরোপের নাইকের জাপানী নাম।

ঋ) যে দেশের সাহায্যে চীন ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। জাপানে নবযুগ আরম্ভ হয় কখন?

২। জাপানে সোগান শাসন সম্পর্কে জনগণের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে কেন?

৩। ইযেযাশু সোগানের লক্ষ্য কি ছিল?

৪। কাকে জাপানের নেপোলিয়ান বলা হয়?

৫। জাপানের প্রথম রাজধানীর নাম কি?

৬। মার্কোপোলো নানা দেশ ঘুরেছিলেন কেন?

৭। মঙ্গোলদের উৎপত্তি কোন জাতি থেকে?

৮। কোন সময় চীনে পানীয় হিসেবে চা ব্যবহার আরম্ভ হয়?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। একটি মানচিত্র এঁকে তাতে কুবলাই খানের রাজ্যসীমা নির্দেশ কর।

২। একটি মানচিত্রে হিউয়েন সাঙের ভারত আগমন ও প্রত্যাগমনের পথ নির্দেশ কর।

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

মধ্যযুগে ভারতবর্ষ

বিষয়-সংকেত :—কবি গেয়েছেন, "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়-চীন, শকহূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" এই হল 'মহাভারতের' সত্যকার পরিচয়। মধ্যযুগেও দেওয়া-নেওয়ার এই মহান যজ্ঞ চলেছিল অবাধ গতিতে। সেই মহাযজ্ঞের ঘটনাবলীই এবার আমাদের আলোচ্য বিষয়।

॥ হুন আক্রমণ ॥

'ভগবানের অভিশাপ' হুনরাজ এটিলা যখন মধ্য ইউরোপে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছেন, তখন হুনদের আর এক শাখা, যারা 'শ্বেত হুন' নামে পরিচিত পারস্য ও কাবুল অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে হিন্দুকুশ পর্বতমালা দিয়ে প্রবেশ করে।

হিন্দুকুশ পেরিয়ে এরা প্রথম গান্ধার ও পরে পাঞ্জাব জয় করে। এই সময় হুনদের রাজা ছিলেন তোরমান। তিনি কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ এবং পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন মালবের দিকে। মালব-রাজ তাঁকে প্রাণপণ বাধা দেন। ফলে হুনদের অগ্রগতি আপাততঃ বন্ধ হল। তা হলেও তোরমান নিজেকে মালব-রাজ বলে ঘোষণা করেন।

হুনরাজ তোরমান

তোরমানের পর হুনদের রাজা হলেন তাঁর পুত্র মিহিরগুল। মিহিরগুল শিয়ালকোটে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। নিষ্ঠুরতার দিক থেকে তিনি ছিলেন যেন আর এক এটিলা। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে গণহত্যাতেই ছিল তাঁর আনন্দ। হিউয়েন সাঙ-ও বলেছেন যে মিহিরগুল বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মস্থান ধ্বংস করেন। তিনি তাঁর পিতার রাজ্যের সীমা আরও বাড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা খুব একটা সফল হয় নি।

মিহিরগুল

এই সময় ভারতবর্ষ শাসন করতো গুপ্ত রাজগণ। তাঁদের

সুশাসনে শান্তি-শৃঙ্খলায় ও ধনে-জনে এ দেশ ছিল যেন এক সোনার দেশ। কিন্তু হুনদের পৈশাচিক আক্রমণে সোনার দেশ ছারখার হয়ে গেল। আরও দুঃখের হল, ঠিক এই সময়েই গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্রাট কে হবে নিয়ে চলছিল এক ঘোরতর বিবাদ। এই সুযোগে হুনেরা প্রায় গুপ্ত সম্রাটের রাজধানী মগধের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাট হলেন স্কন্দগুপ্ত। তিনি সিংহাসনে বসেই হুনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁর বীরত্বের কাছে পরাজিত হয়ে হুনেরা তাঁর রাজ্য ছেড়ে পালালো।

স্কন্দগুপ্ত

কিন্তু স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর আবার হুন আক্রমণ আরম্ভ হল। এবার আর স্কন্দগুপ্তের মত শক্তিশালী গুপ্ত রাজা ছিলেন না। তাঁরা পারলেনও না হুনদের আক্রমণ ঠেকাতে। আর হুনেরাও সারা দেশ জুড়ে অবাধে লুণ্ঠন-হত্যা চালাতে লাগলো।

চীনদেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য নামে এক গুপ্ত সম্রাট আর একবার হুনদের পরাজিত করেছিলেন, এমন কি হুননেতা মিহিরগুলকে বন্দীও করেছিলেন। কিন্তু মায়ের অনুরোধে নরসিংহ মিহিরগুলকে মুক্তি দেন।

নরসিংহগুপ্ত

ভারতের আর এক রাজা হুনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। ইনি হলেন যশোধর্মণ। তিনিও মিহিরগুলকে পরাস্ত করেছিলেন। মালব প্রদেশের মান্দাসোর নামক স্থানে এক শিলালিপি থেকে জানা যায়, যশোধর্মণ উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ-ও তাঁর বিবরণীতে যশোধর্মণের কথা উল্লেখ করেছেন।

যশোধর্মণ

যাই হোক, তোরমান বা মিহিরগুল যা পারেন নি তাই পেরেছিল পরবর্তী হুন সর্দারগণ। তাদের সময়ে পাঞ্জাব, রাজপুতনা,

মালব প্রভৃতি স্থান নিয়ে এক বিরাট এলাকা জুড়ে হুনদের একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

॥ হুন আক্রমণের গুরুত্ব ॥

হুনেরা আসলে ছিল যাযাবর জাতি। লুণ্ঠন ও হত্যাই ছিল তাদের স্বভাব। কিন্তু ভারতবর্ষে এসে তাদের স্বভাব-চরিত্রের একেবারে আমুল পরিবর্তন হয়ে যায়। তারা ক্রমশঃ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শেখে, ঘর-সংসার করতে শেখে, ধীরে ধীরে তারা এদেশের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হয়। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, আজকের যারা রাজপুত জাতি তাদেরই পূর্ব-পুরুষ হল হুনেরা।

চরিত্রের পরিবর্তন

শুধু তাই নয়। খুব সম্ভবতঃ তারা এদেশে এসে এখানকার ধর্ম হিন্দুধর্মও গ্রহণ করেছিল। কারণ তারা যে সমস্ত মুদ্রার প্রচলন করেছিল তার মধ্যে কয়েকটিতে শিবের বাহন ষাঁড়ের মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। এর থেকেই মনে করা হয়, তারা সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল।

হিন্দুধর্ম গ্রহণ

॥ গুপ্তযুগের অবসান ও হর্ষবর্ধন ॥

গুপ্ত সম্রাটদের সবচেয়ে বড় অবদান হল, তাঁরা এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দূর করেছিলেন। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের অবসানের পর সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এদের মধ্যে অন্যতম হল কান্যকুব্জের মৌখরী রাজ্য। মৌখরীরাজ ঈষাণবর্মণ হুনদের পরাজিত করে রাজ্যের আয়তন বাড়িয়ে নেন। তাঁর রাজধানী ছিল কান্যকুব্জ বা কনৌজ। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রাজ্য হল, পূর্ব পাঞ্জাবে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ এবং বাংলাদেশের গৌড় রাজ্য।

গুপ্তোত্তর অবস্থা

॥ হর্ষবর্ধনের পরিচয় ॥

থানেশ্বরের রাজ্য সেই সময় সাফল্যের সঙ্গে হুন আক্রমণ প্রতিহত করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এই রাজ্যের রাজা প্রভাকরবর্ধনকে বলা হত "হুন-হরিণ-কেশরী"। প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল কনৌজরাজ গ্রহবর্মণের। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর থানেশ্বরের রাজা হন তাঁর বড় ছেলে রাজ্যবর্ধন। এই সময় মালব-রাজ দেবগুপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে মিলিত হয়ে কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মণ নিহত হন আর রাজ্যশ্রী হন বন্দিনী। এই আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু শশাঙ্কের চক্রান্তে নিহত হন। ফলে একই সঙ্গে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন শূন্য হ'ল। তখন এই দুই রাজ্যের শূন্য সিংহাসনে বসলেন রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন।

পূর্ব পরিচয়



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন প্রথমেই ভগ্নী রাজ্যশ্রিকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হলেন। রাজ্যশ্রী এই সময় শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে এক জায়গায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্ম বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখন হর্ষবর্ধন সেখানে গিয়ে পৌঁছান, ভগ্নীকে উদ্ধার করেন এবং তাঁকে কনৌজে নিয়ে আসেন। এইবার তাঁর লক্ষ্য হল তাঁর ভ্রাতার হত্যাকারী গৌড়রাজ শশাঙ্ককে উপযুক্ত শাস্তি দান।

সিংহাসন লাভের পর

॥ হর্ষবর্ধনের রাজ্য জয় ॥

এই উদ্দেশ্যে হর্ষবর্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সাহায্যে

গৌড়রাজ শশাঙ্ককে শাস্তি দিতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু শশাঙ্ক যতকাল জীবিত ছিলেন ততদিন হর্ষবর্ধন ঠিক তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠেন নি। অবশ্য শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন।

শশাঙ্কর সঙ্গে যুদ্ধ

এর পর আর কয়েকটি যুদ্ধ করে উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই হর্ষবর্ধন জয় করে নেন। উত্তর ভারতের পর হর্ষবর্ধনের দৃষ্টি গেল দক্ষিণ ভারতের দিকে। কিন্তু এই অঞ্চলে তাঁর রাজ্য জয়ের চেষ্টা সফল হয় নি। কারণ দক্ষিণ ভারতের চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে তিনি পরাজিত হন এবং আর বেশী না এগিয়ে উত্তর ভারতে ফিরে আসেন।

চালুক্য রাজের সঙ্গে যুদ্ধ

হর্ষবর্ধনের লক্ষ্য ছিল সারা ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করা। কিন্তু তাঁর সে লক্ষ্য পূরণ না হলেও উত্তর ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা ছিল, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে আসাম এবং পশ্চিমে রাজপুতনা, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও কাশ্মীর। তাঁর রাজধানী কনৌজ ছিল এক চমৎকার সুরক্ষিত নগরী। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, উদ্যান ও সরোবর দিয়ে সাজানো। হিউয়েন সাঙ-ও এই নগরের খুব প্রশংসা করেছেন।

রাজধানীর পরিচয়

॥ হর্ষবর্ধনের চরিত্র ॥

হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন পরাক্রান্ত সম্রাট, ধার্মিক, প্রজাবৎসল, দানশীল এবং বিদ্বান। তাঁর মত সম্রাট পৃথিবীর ইতিহাসেই খুব কম দেখা যায়। তাঁর সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষ রচিত' থেকে হর্ষবর্ধনের জীবনের নানা কথা জানা যায়। হিউয়েন সাঙ-ও তাঁর শাসনকালের অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। হর্ষবর্ধন রচিত নাগানন্দ,

প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী এই তিন গ্রন্থ থেকে হর্ষের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলো সংস্কৃত ভাষায় লেখা। হর্ষ প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে তিনি বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হন।

॥ হিউয়েন সাঙ-এর ভারত আগমন ও তাঁর বিবরণ ॥

হর্ষবর্ধনের শাসনকালে চীন দেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এদেশে এসেছিলেন।

ভারতে আসার কারণ

হিউয়েন সাঙ সে সময়ের চীনের রাজধানী চ্যাং-আন-এর এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তখন চীনে তাং বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা তাই স্তুঙের রাজত্বকাল। তথাপি চীনের তখন ঘোর দুর্দিন, নৈতিক জীবন বলে কিছু ছিল না। চীনে এই সময় বৌদ্ধধর্মের নানা বিকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছিল। এটাই ছিল হিউয়েন সাঙ-এর বেদনার কারণ। তাই তিনি বৌদ্ধধর্মের দেশ ভারতবর্ষে ঐ ধর্মের আসল কথা জানতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

অনেক কষ্ট স্বীকার করে নানা পথ ঘুরে তিনি ভারতে এসে পৌঁছান। এদেশে তিনি চোদ্দ বৎসর কাটিয়েছিলেন। এখান থেকে ফিরে গিয়ে 'সি ইউ কী' বা পশ্চিম দেশ ভ্রমণ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকে সে সময়ের ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা কথা আমরা জানতে পারি।

বিবরণ

তিনি উত্তর ভারতের অনেক স্থানে পরিত্যক্ত নগরীর বর্ণনা দিয়েছেন। মনে হয় শত্রুর আক্রমণে এই শহরগুলো ধ্বংস হয়েছিল। আবার তিনি অনেক জনবহুল সমৃদ্ধ শহর ও গ্রামের কথাও বলেছেন।

ভারতীয় চরিত্র

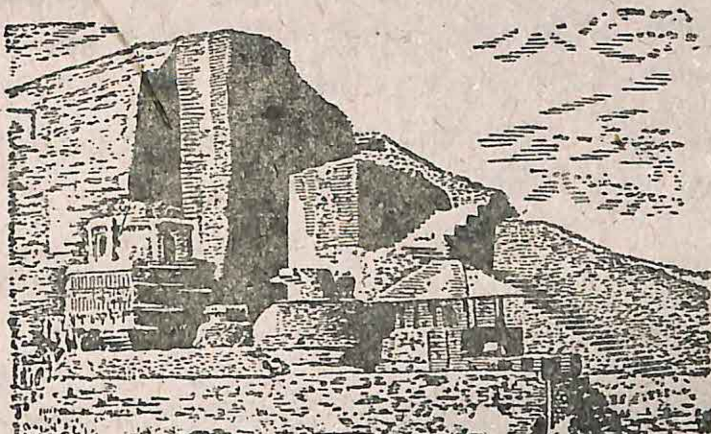
তিনি ভারতীয়দের চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তারা অন্যায়ভাবে কখনো কারো জিনিস গ্রহণ করতো না। ভারতীয়দের বেশ-ভূষাতেও ছিল রুচিবোধের পরিচয়। আর তারা ছিল বিশেষ অতিথিপরায়ণ।

হর্ষবর্ধন কনৌজে যে বৌদ্ধধর্ম সম্মেলন ও প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর প্রয়াগে যে মেলার আয়োজন করতেন তার কথাও হিউয়েন সাঙ বলেছেন। ঐ মেলাতেই হর্ষবর্ধনের দানশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সব কিছু দান করে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় হর্ষবর্ধন মেলা থেকে ফিরে যেতেন। আর বৌদ্ধধর্ম সম্মেলন হিউয়েন সাঙ নিজে যোগদান করেছিলেন এবং আলোচনায় অংশও নিয়েছিলেন।

কনৌজের মেলা

॥ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

তখনকার দিনে ভারতবর্ষ ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সে সময়ের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ

পাটলিপুত্রের কাছেই অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউয়েন সাঙ জ্ঞানচর্চা করেছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাকেন্দ্র। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী শীলভদ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার ছিল খুবই কঠিন। সত্যকার মেধাবী ছাত্র ছাড়া ভর্তি হওয়াই যেত না।

ভর্তির পদ্ধতি

তখন এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার। বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র ছাড়া বৈদিক সাহিত্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র ও

পাঠ্য বিষয়

তৎকালীন সাহিত্য এখানে পড়ানো হত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি ছিল জগৎবিখ্যাত।

॥ হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকাল ॥

হর্ষের শাসনকালে অল্প কিছুদিনের জন্য উত্তর ভারতে রাজনৈতিক স্থিরতা এসেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আবার সেই অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হয়।

উত্তর ভারতে এই অস্থিরতার প্রধান কেন্দ্র ছিল কনৌজ। এই নগরটি শুধু হর্ষবর্ধনের রাজধানী-ই ছিল না, একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানও ছিল। উত্তরাঞ্চলের সমভূমিতে এমন জায়গায় কনৌজ অবস্থিত

কনৌজের গুরুত্ব ও ত্রিমুখী লড়াই

যে এই নগরটি দখল করতে পারলেই সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রাধান্য নিশ্চিত হয়ে যায়। তাই এই নগরটিকে কেন্দ্র করে এই সময় তিনটি রাজবংশের মধ্যে এক প্রবল ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই রাজবংশগুলো হল : রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার এবং পাল।

দক্ষিণ ভারতে বর্তমান নাসিকের নিকটে রাজত্ব করতো রাষ্ট্রকূট বংশ এদের রজেধানী ছিল মালখেদ। এদের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্য পল্লব ও চালুক্যদের আদৌ সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু উচ্চাভিলাষী

রাষ্ট্রকূট

রাষ্ট্রকূটগণ চেয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের মত উত্তর ভারতেও রাষ্ট্রকূটদের প্রভাব বিস্তার করতে। স্বভাবতঃই এই কারণে তাঁর দৃষ্টি পড়লো কনৌজ দখল করার দিকে।

প্রতিহারগণের রাজ্য ছিল অবন্তী এবং দক্ষিণ রাজস্থানের কতকাংশে। সাধারণ অমাত্য থেকে প্রতিহারগণ স্বাধীন রাজবংশ

স্থাপন করে। ম্লেচ্ছদের দমন করে এরা প্রথম শক্তি সঞ্চয় করে।

প্রতিহার

ম্লেচ্ছ বলতে খুব সম্ভবতঃ আরবীয়দের বোঝায়। এই সময় আরবীয়গণ সিন্ধু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এইবার প্রতিহারগণ ভারতের আরও ভিতরে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে উদ্যোগী হয় এবং অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ নাগাদ তারা কনৌজও জয় করেছিল।

বাংলার পালরাজারা কনৌজ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিল। এঁরা প্রায় চারশ বৎসর ধরে শাসন করেছিলেন এদের সাম্রাজ্যের পরিধি ছিল সমগ্র বাংলা এবং বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল। সুতরাং

পাল বংশ

নিজেদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই এদের প্রয়োজন ছিল কনৌজের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

এইভাবে রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পাল—এই তিন শক্তির একই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো কনৌজ অধিকার করা। এই অধিকারের দ্বন্দ্ব চলেছিল প্রায় একশ বৎসর—অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নবম

দ্বন্দ্বের নায়কগণ

শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত। আর এই দ্বন্দ্বের নায়কগণ হলেন, রাষ্ট্রকূটদের পক্ষে রাজা ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দ। প্রতিহারগণের পক্ষে রাজা বৎসরাজ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট। আর পালদের পক্ষে ধর্মপাল ও দেবপাল।

এই ত্রিকোণী দ্বন্দ্বের প্রথমে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ বাংলার ধর্মপালকে দোয়াবের যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর সামন্ত ইন্দ্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। কিন্তু তিনি আবার রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবর কাছে পরাজিত হন। এই সুযোগে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন এবং কনৌজ থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়ন করে তাঁর সামন্ত

ত্রিকোণী যুদ্ধ

চক্রায়ুধকে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ধর্মপালের এই সাফল্যও দীর্ঘস্থায়ী হল না। কারণ তিনি আবার প্রতিহাররাজ নাগভট্টের কাছে মুঙ্গেরের যুদ্ধে পরাজিত

হলেন। আবার নাগভট্ট পরাজিত হলেন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কাছে। এর মধ্যে ধর্মপালের পর পাল রাজা হন দেবপাল। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ কনৌজ দখল করে নেন।

এই যে ত্রিকোণী দ্বন্দ্ব -এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। পাল, রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহারগণ বার বার কনৌজ নিয়ে এত দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করতে করতে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে তারা নিজেরাই নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছিল। তবু উত্তর ভারতে আধিপত্য নিয়ে প্রশ্নের মীমাংসা হল না। তাই দেখা গেল রাষ্ট্রকূটগণের প্রতিবেশী চালুক্যগণ তাদের রাজ্য গ্রাস করে নিল। পালবংশের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল নতুন রাজবংশ—সেনবংশ। প্রতিহার বংশ ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গিয়ে উদীয়মান শক্তি রাজপুতদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ত্রিকোণী যুদ্ধের শেষ

॥ রাজপুত জাতির উত্থান ॥

কৌতূহলময় দীর্ঘ ইতিহাস রাজপুত জাতির। রাজপুত কারা, কোথা থেকে তারা এল, কোথায় তারা ছিল—এ সবই এখনো রহস্যময়। কেউ কেউ বলেন, হুন জাতির অক্রমণের পর মধ্য এশিয়া থেকে আগত কোন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল তারা। তারা ছিল দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কিন্তু রাজপুতগণ নিজেরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তারা বলে, হয় তারা প্রাচীন ভারতের সূর্য বংশ থেকে উদ্ভূত নতুবা তারা চন্দ্র বংশজাত। আবার তাদের চারটি গোষ্ঠী দাবী করে যে তারা এই দুই বংশের কোনটা থেকেই আসে নি, তাদের উৎপত্তি হচ্ছে অগ্নি বংশ থেকে। এই চার গোষ্ঠীই হচ্ছে সর্বাধিক ক্ষমতাশালী। গোষ্ঠী চারটি হল: প্রতিহার, চৌহান, সোলাংকী এবং পাওয়ার।

পূর্ব পরিচয়

এই চার গোষ্ঠী সমগ্র পশ্চিম ভারত জুড়ে এবং মধ্য ভারতের

কতকাংশ জুড়ে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে। প্রতিহারদের শাসন ছিল কনৌজকে কেন্দ্র করে। চৌহানদের প্রাধান্য ছিল মধ্য রাজস্থানে। কাথিওয়াড়-এর কাছাকাছি অঞ্চলে ছিল সোলাংকিদের শাসন। আর মালব অঞ্চলে ছিল পাওয়ারদের প্রাধান্য। প্রথমে এরা রাষ্ট্রকূট বা প্রতিহারগণের অধীন ছিল। পরে এরা স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়া কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি স্থানে ছিল ছোট ছোট রাজ্য। এদের সঙ্গে রাজপুত শক্তির কোন যোগাযোগই ছিল না। যোগাযোগ ছিল মধ্যভারত ও রাজস্থানের বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যের। কিন্তু এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকতো। যে কোন আক্রমণের মুখোমুখি হবার মত নিজস্ব ক্ষমতা এদের কারোরই ছিল না। তারা আবার এত ক্ষমতাপ্রিয় ছিল যে কোন রাজশক্তির কাছে নতি স্বীকারও করতে চাইতো না। ফলে বিভেদ আর বিবাদের মধ্যেই তারা দিন কাটাতো।

॥ সমসাময়িক বঙ্গদেশ ॥

বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হলেন শশাঙ্ক। থানেশ্বরে প্রভাকরবর্ধন যখন ক্রমশঃ এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করছিলেন তখন বঙ্গদেশে গৌড়কে কেন্দ্র করে এক স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন শশাঙ্ক। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত কিছুই জানা যায় না। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদের কাছে কর্ণসুবর্ণ। সমগ্র বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা নিয়ে এক বিশাল রাজ্য তিনি গড়ে তোলেন। থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন কেউই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সফল হতে পারেন নি। তাঁরই কৃতিত্বে উত্তর ভারতে সামরিক শক্তিতে বঙ্গদেশের মর্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। হিউয়েন সাঙ অবশ্য শশাঙ্কের কোন প্রশংসাই করেন নি। তার কারণ এটা হতে পারে যে তিনি ছিলেন হর্ষবর্ধনের খুব প্রিয় আর এই হর্ষেরই বিশেষ শত্রু ছিলেন শশাঙ্ক।

॥ পাল বংশ ও সেন বংশ ॥

শশাঙ্কের নেতৃত্বে স্বল্প কালের জন্য বঙ্গদেশ যে গৌরব অর্জন করে, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই গৌরবের দিন শেষ হয়ে আসে। শক্তিশালী রাজার অভাবে আবার সারা দেশ জুড়ে নেমে আসে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা। তখন সাধারণ মানুষ দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজা বলে মেনে নেয়। এই গোপালই হল পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাল বংশ বঙ্গদেশে দীর্ঘ চারশ' বৎসর রাজত্ব করেছিল।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠা

এই বংশের বিখ্যাত রাজারা হলেন গোপালের পুত্র ধর্মপাল এবং ধর্মপালের পুত্র দেবপাল। এঁদের দুজনের সামরিক কৃতিত্বে বঙ্গদেশ আবার এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। সমগ্র উত্তর ভারতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা বিখ্যাত 'ত্রিকোণী' যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

এই বংশের গৌরবময় সময়

দেবপালের পরই পাল বংশের পতন আরম্ভ হয়। তার কারণ তাঁদের মত ক্ষমতাশালী রাজা আর দেখা যায় না। শেষের দিকের রাজাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল, রামপাল এবং মহীপাল। এঁদের সময়ে পাল বংশ তাদের লুপ্ত মর্যাদা কতকাংশে ফিরে পায়।

এই বংশের পতন

পাল বংশের পর কিছুকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন সেন বংশ। সেনবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে কিংবা কি করে তাঁরা বঙ্গদেশে এলেন—এসব বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা হল বিজয় সেন। ইনি পাল রাজবংশের মদন পালকে পরাজিত করেছিলেন।

সেন বংশের উত্থান

বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন একজন শক্তিশালী রাজা

ছিলেন। পরবর্তী রাজা লক্ষ্মণ সেনও যথেষ্ট সামরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। বেনারস ও এলাহাবাদ পর্যন্ত তাঁর প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। অন্ততঃ অধিকাংশ বিহারই যে তাঁর দখলে ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী বা আজকের নদীয়া। কিন্তু এত কৃতিত্ব সত্ত্বেও লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালেই বঙ্গদেশ তার স্বাধীনতা হারায়। এ সময়েই বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে মুসলমানগণ বঙ্গদেশ দখল করে নেয়।

বল্লাল ও লক্ষ্মণ

মুসলমান জয়

॥ পাল ও সেন আমলে বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

॥ সমাজজীবন ॥

পালযুগে অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবী। অন্যান্য জীবিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কামার, তাঁতী, রজক প্রভৃতি। রাজকর্মচারীদের নিয়ে ছিল একটা পৃথক শ্রেণী। ব্যবসা-বাণিজ্য করেও বহু লোক জীবন যাপন করতো। এই সময় জাতিভেদ প্রথা ছিল, কিন্তু তা খুব কঠোর ছিল না। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা না থাকার পেছনে ছিল নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব।

জীবিকা

এ সময় মেয়েদের লেখাপড়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তখনও তাদের চলাফেরার উপর বিধি-নিষেধ জারী করা হয় নি। মেয়েরা শাড়ী পরতো আর ব্যবহার করতো নানা রকমের অলংকার।

নারীর স্থান

সে সময় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে প্রধান ছিল পাশা, দাবা এবং নাচ-গান। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বীণা, বাঁশী, করতাল, ঢাক, ঢোল প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। পুরুষেরা শিকার, কুস্তি এবং নানা রকম ব্যায়ামের চর্চা করতো।

আমোদ-প্রমোদ

সে আমলে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি, দুধ এবং দুধজাত দ্রব্য। মদ্যপান ছিল খুবই নিন্দার ব্যাপার।

খাদ্য

সেন রাজাদের আমলে সমাজে গোঁড়ামি অনেক বেড়ে যায়। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ওপর নানা রকম বাধা-নিষেধ চাপানো হত। বল্লাল সেনই বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন করেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন, বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সমাজজীবনে যে শিথিলতা এসেছিল তা দূর করতেই প্রয়োজন সামাজিক গোঁড়ামি। তাই প্রবর্তিত হল কৌলীন্য প্রথা।

কৌলীন্য প্রথা

॥ ধর্ম ॥

পাল রাজাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী। তাঁদের চেষ্টায় অনেক বৌদ্ধ মঠ ও বিহার গড়ে ওঠে। ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে তাঁদেরই আগ্রহে। কিন্তু নিজেরা বৌদ্ধ হলেও অন্য ধর্মের লোকদের ওপর কখনো অত্যাচার করা হয় নি। বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের লোকেরা বিনা বাধায় নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারতো।

পালযুগ

কিন্তু সেন রাজারা ছিলেন শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি অনুগত। এই সময় আবার হিন্দুধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বও ফিরে আসে। ফলে এই সময় পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা ও যাগযজ্ঞ আবার নতুন করে আরম্ভ হয়।

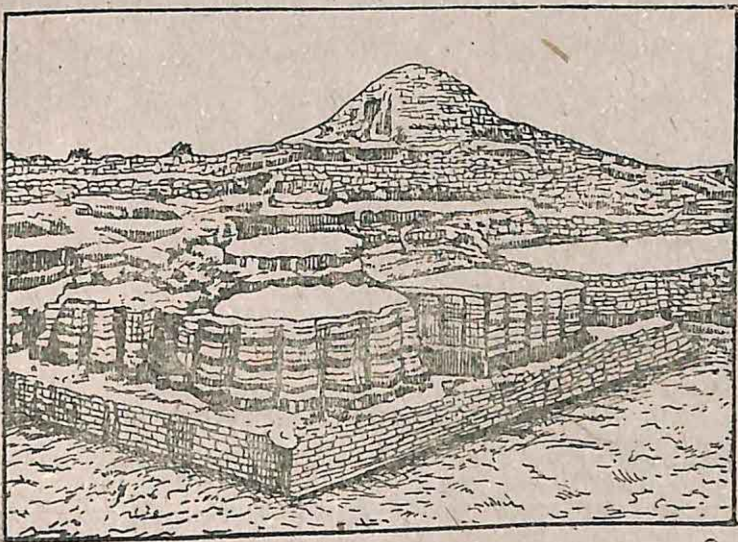
সেনযুগ

॥ শিক্ষা ॥

পাল রাজারা বিদ্যা ও বিদ্বানদের যথেষ্ট সমাদর করতেন। শোনা যায় কেবল ধর্মপালই নাকি নতুন পঞ্চাশটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

কিন্তু ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ে যে অনেক নতুন নতুন শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সব শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে বিখ্যাত ছিল বিহারের ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল বিহার এবং বঙ্গদেশের সোমপুরী ও বিক্রমপুরী বিহার। বঙ্গদেশের বিহার দুটিতে তিব্বত ও সারা ভারত থেকে অনেক শিক্ষার্থী আসতো জ্ঞান অর্জন করতে। বিক্রমশীল বিহার প্রতিষ্ঠা

বিক্রমশীল বিহার



সোমপুর বিহারের ধ্বংসস্তূপ

করেন ধর্মপাল। এই বিহারে ছিল একশ' আটটি মন্দির, ছয়টি শিক্ষা-কেন্দ্র আর একশ' চোদ্দ জন মেধাবী ছাত্র। এই বিহারেরই অধ্যক্ষ ছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ। ইনি পরবর্তীকালে তিব্বত রাজার অনুরোধে তিব্বত গিয়েছিলেন এবং বাকী জীবন সেখানেই কাটান। তাঁরই চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাই আজও তিনি সেখানে পূজিত হন। তাছাড়া বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ধর্মপাল।

॥ সাহিত্য ॥

পালযুগে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী সংস্কৃত ভাষায় রামচরিত নামে এক কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের দুরকম অর্থ হয়। একদিকে কাব্যটি হল রামচন্দ্রের কথা, অন্যদিকে পালরাজ রামপালের কাহিনী। তাছাড়া চক্রপাণি দত্ত আয়ুর্বেদ চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন। সেন যুগেও সংস্কৃত ভাষার চর্চা অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময়ের বিখ্যাত কবি হলেন জয়দেব। তাঁর রচিত গীত গোবিন্দ এখনো সমান জনপ্রিয়।

সংস্কৃত ভাষা

পালযুগে বাংলা ভাষার অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছিল। যে চর্যাপদ বাংলা ভাষার আদিরূপ তা রচিত হয়েছিল এই সময়েই। সেনরাজ লক্ষ্মণসেন দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দুখানা গ্রন্থ রচনা করেন।

বাংলা ভাষা

॥ সমসাময়িক কালে দক্ষিণ ভারত ॥

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে মধ্যযুগই এক চমৎকার ব্যতিক্রম যখন উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই সম্পর্ক স্থাপনে বিন্ধ্য পর্বতমালা কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। নতুন এই যোগাযোগের কারণ হল প্রথমতঃ দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো এই সময় উত্তর ভারতেও রাজ্য বিস্তারে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় আন্দোলন উত্তর ভারতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তৃতীয়তঃ উত্তর ভারত থেকে অনেক ব্রাহ্মণ দক্ষিণ ভারতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এসব কারণে ভারতবর্ষের এই দুই অংশ এই সময়ে আর আগেকার মত পরস্পরের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারলো না।

উত্তর ও দক্ষিণের নৈকট্য

এই সময় রাষ্ট্রকূট ছাড়া দক্ষিণ ভারতের উল্লেখযোগ্য রাজ-

বংশগুলো হল, বাদামীর চালুক্য বংশ, কাঞ্চীর পল্লব বংশ এবং তান্‌জোরের চোল বংশ।

॥ বাদামীর চালুক্য বংশ ॥

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চালুক্য বংশের রাজা প্রথম পুলকেশী এক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বর্তমান বিজাপুর জিলার বাদামী নগরে।

দ্বিতীয় পুলকেশী

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। ইনি হর্ষবর্ধনকেও পরাজিত করেছিলেন। সারা দক্ষিণ ভারত জুড়ে এক বিরাট রাজ্য তিনি গড়ে তুলেছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর রাজ্যসভায় ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন।

পতন

কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর পর তাঁর সাম্রাজ্যের শক্তি অনেক কমে যায়। কারণ কাঞ্চীর পল্লবগণের সঙ্গে ছিল তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয় পুলকেশীও পরাজিত হয়েছিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল প্রায় দুশ' বছর ধরে। এত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে দুটি বংশই ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। কেউ কাউকেই একেবারে ধ্বংস করতে পারে নি।

॥ চালুক্যদের অবদান ॥

চালুক্য রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী। তাঁদের উদ্যোগে তৈরী হয় সঙ্গমেশ্বর ও বিরূপাক্ষদেবের দুটি মন্দির। এই দুই মন্দিরের গায়ে আছে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য। চিত্রশিল্পেও চালুক্যগণ উন্নত ছিল। অনেকে বলেন, অজন্তার কয়েকটি চিত্র নাকি চালুক্যদের সময়ই আঁকা হয়েছিল। চালুক্যগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্যও বিখ্যাত ছিলেন।

॥ কাঞ্চীর পল্লবগণ ॥

চালুক্যদের তুলনায় পল্লব রাজাদের ইতিহাস অনেক বেশী

প্রাচীন। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তও পল্লবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যাই হোক পল্লব রাজবংশ বলতে কিন্তু বিশেষ কোন রাজবংশকে বোঝায় না। অনেক রাজবংশই পল্লব রাজ্যে রাজত্ব করে গিয়েছেন। আর তাঁরা সবাই চেয়েছেন, দক্ষিণ ভারতে পল্লব রাজ্যকে একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্যে পরিণত করতে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কাঞ্চী নগরে।

নরসিংহ বর্মণ

পল্লব বংশের প্রথম বিখ্যাত রাজা হলেন নরসিংহ বর্মণ। ইনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর মত শক্তিশালী রাজাকেও পরাজিত করেছিলেন। তাঁর এক সুসজ্জিত নৌবাহিনীও ছিল। তাঁর নৌবাহিনী দুবার সিংহল আক্রমণ করে।

নরসিহ বর্মণের পরবর্তী রাজাদের বেশী সময়ই কেটে যায় চালুক্য রাজাদের বিরোধিতায়। এইভাবে ক্রমশঃ তাঁদের শক্তি ক্ষয় পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চোলদের রাজা প্রথম আদিত্য পল্লব রাজ্য অধিকার করে নেন।

॥ পল্লবদের অবদান ॥

পল্লব রাজাদের অনেকেই ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তখন কাঞ্চী ছিল সারা দেশে সংস্কৃত শিক্ষার এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ভারবি এবং অলংকার শাস্ত্রবিদ দণ্ডী পল্লব যুগেই জন্মেছিলেন। এই যুগে তামিল সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।

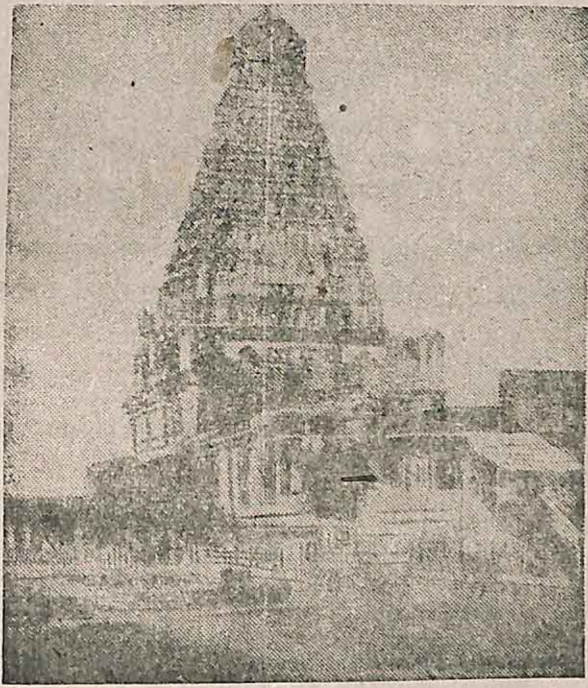
মহাবল্লীপুরম

এই সময়েই পাহাড় কেটে, পাথর কুঁদে মন্দির তৈরীর এক অপূর্ব কৌশল আবিষ্কৃত হয়। এই কৌশলের এক চমৎকার নিদর্শন মহাবল্লীপুরমের বিখ্যাত রথমন্দির। অন্যান্য মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কাঞ্চীর ত্রিপুরান্তকেশ্বর এবং ঐরাবতেশ্বরের মন্দির।

॥ তান্‌জোরের চোল বংশ ॥

সম্রাট অশোকের সময়ও দক্ষিণ ভারতে চোলগণ স্বাধীনভাবে

রাজ্য স্থাপন করেছিল। পরে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মণকে পরাজিত করে তান্‌জোর দখল করেন এবং সেইখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।



তান্‌জোরের শিবমন্দির

চোল রাজবংশে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিলেন রাজেন্দ্র চোল। ইনি শুধু দক্ষিণভারতেই নন, মধ্যভারতে কোশল ও পূর্বভারতে বঙ্গদেশে তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ছিল দুর্ধর্ষ নৌবাহিনী। এই বাহিনী আন্দামান-নিকোবর, ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ এবং সুমাত্রা ও মালয়ের কিছু অংশ জয় করেছিল।

রাজেন্দ্র চোল

কিন্তু এরপর চোল বংশ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। শেষ

পর্যন্ত খলজী বংশের আলাউদ্দীন খলজী চোল বংশের অবসান ঘটান। দেশশাসনের দক্ষতায় ও শিল্পসৃষ্টির নৈপুণ্যে চোলদের যে অবদান তা ভোলবার নয়। তান্‌জোরের একশ' নব্বুই ফুট উঁচু শিবমন্দির এ সময়েই নির্মাণ করা হয়। তাদের নির্মিত মন্দিরগুলো বিশাল আকারের। এ ছাড়া তারা খাল কেটে বা বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা করে। সাগর পেরিয়ে দেশ জয় করে প্রকৃতপক্ষে তারা বিদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও বাণিজ্য বিস্তারে সাহায্য করেছিল।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

দীর্ঘ গুপ্ত শাসনকাল এবং সংক্ষিপ্ত হর্ষবর্ধনের শাসনকাল বাদ দিলে সুলতানী যুগ পর্যন্ত দীর্ঘকালের ভারতের ইতিহাস হল রাজনৈতিক অস্থিরতার কাল। তবু এ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও বেশী সম্পদশালী করতে বাংলার পাল বংশ এবং দক্ষিণভারতের পল্লব ও চোল বংশের অবদান কখনোই ভুলে যাবার নয়।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। গুপ্তযুগের শেষ ভাগে কারা এদেশ আক্রমণ করেছিল? তাদের বিখ্যাত নেতা কে ছিলেন? কোন্ কোন্ ভারতীয় রাজা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিলেন?

২। হিউয়েন সাঙ কে ছিলেন? তিনি কেন ভারতবর্ষে এসেছিলেন? এদেশে তিনি কতদিন ছিলেন? এ দেশ সম্পর্কে তিনি কি কি মত প্রকাশ করেছিলেন?

৩। উত্তর ভারতের কোন্ নগরকে কেন্দ্র করে দীর্ঘকালব্যাপী লড়াই চলেছিল এবং কেন চলেছিল? এই লড়াইকে কি বলে? কোন্ কোন্ শক্তি এই লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল?

৪। রাজপুত কারা? এদের চারটি ভাগ কি কি? এই ভাগগুলো কোন্ কোন্ অঞ্চলে রাজত্ব করতো?

৫। পাল ও সেন যুগে বঙ্গদেশের সমাজজীবনের বর্ণনা দাও।

৬। ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লব ও চোল রাজাদের অবদান আলোচনা কর।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। হর্ষবর্ধন ভারতে রাজ্য জয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করেন কেন ?

২। ভারতে আসার পর হুনদের মধ্যে কি কি পরিবর্তন হয়েছিল ?

৩। কোন্ সময় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় ? এই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কেন ?

৪। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

যশোধর্মণ, কনৌজের মেলা; নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, কৌলীন্য প্রথা, বিক্রমশীল বিহার, দীপংকর, অতীশ শ্রীজ্ঞান।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

অ) হর্ষ তাঁর রাজধানী থানেশ্বর থেকে — সরিয়ে নিয়ে যান।

আ) বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হলেন —।

ই) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন —।

ঈ) চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন —।

উ) চোলরাজ — নৌবাহিনী অনেক পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জয় করেছিল।

ঊ) পল্লব রাজ্যের রাজধানী ছিল —।

২। নিচের বাক্যগুলোতে ভুল থাকলে সংশোধন কর :—

অ) শ্বেত হুনদের এক শাখা ভারতে এসেছিল।

আ) ধারণা করা হয় হুনরাও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল।

ই) হর্ষ রচিত 'হর্ষ চরিত' থেকে তাঁর শাসনকালের অনেক তথ্য জানা যায়।

ঈ) এ দেশের কথা জানতে হিউয়েন সাঙ ভারতে এসেছিলেন।

উ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান।

৩। 'ক' স্তম্ভের বিবরণের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের নামগুলো মেলাও :—

(ক)	(খ)
অ) বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাগার	অ শশাঙ্ক
আ) হর্ষের দানশীলতা	আ) কৌলীন্য
ই) রহস্যময় পরিচয়	ই) নালন্দা
ঈ) হিউয়েন সাঙ-এর বিদ্বেষ	ঈ) প্রয়াগ
উ) জাতিভেদে কঠোরতা	উ) রাজপুত

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। ভারতের বাইরেও রাজ্য জয় করেছিলেন দক্ষিণভারতের কোন রাজা ?

২। চোলদের তৈরী মন্দিরগুলোর বৈশিষ্ট্য কি ?

৩। মহাবল্লীপুরমের মন্দির কিভাবে নির্মিত হয়েছিল ?

৪। পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ? সামরিক দিক থেকে তাঁর প্রধান কীর্তি কি ?

৫। কোন্ বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিনি কেন গিয়েছিলেন ?

৬। ধর্মপাল কর্তৃক নির্মিত দুটি বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারের নাম বল।

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। ভারতের একটি মানচিত্র অংকন কর এবং তাতে নিচের স্থানগুলো নির্দেশ কর :—

অ) কনৌজ, মগধ, গৌড়, তান্জোর, কাঞ্চী, মহাবল্লীপুরম, নালন্দা, শিয়ালকোট।

আ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা নির্দেশ কর।

২। এশিয়ার একটি মানচিত্রে হিউয়েন সাঙ কোন্ পথ দিয়ে ভারতে এসেছিলেন এবং ভারতের কোন্ কোন্ বিখ্যাত স্থানে গিয়েছিলেন তা নির্দেশ কর।

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

ভারতের বাইরে ভারত

বিষয়-সংকেত ঃ একটা গান আমরা সবাই শুনেছি—"বল বল বল সবে/শত বীণা বেণু রবে/ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" একদিন কিন্তু জগৎসভায় আমাদের দেশের খুবই সম্মানের আসন ছিল। একদিন ভারতের বাইরে ভারত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। সেই সাম্রাজ্য গড়েছিল যুদ্ধ জয় করে নয়, ভারত তার প্রেম-ভালবাসা তার সভ্যতা-সংস্কৃতি দিয়ে। এ এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্য। এবার আমরা সেই সাম্রাজ্যেরই পরিচয় পাবো।

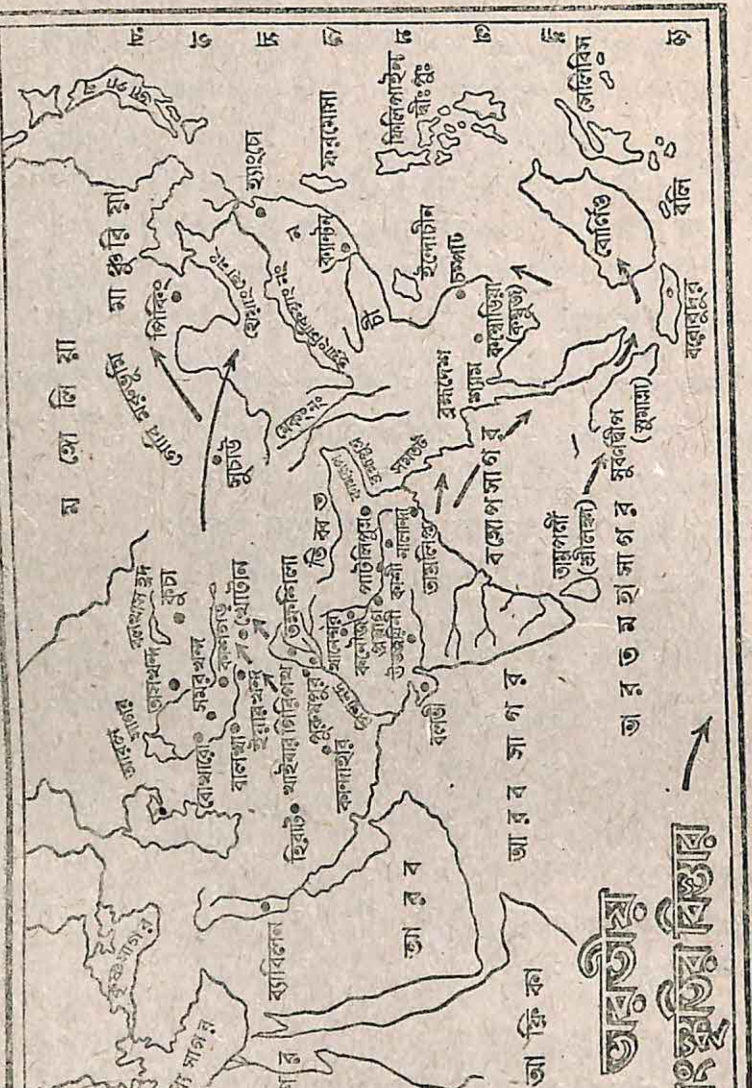
বহু প্রাচীনকাল থেকেই, সেই সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে নানা দেশের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী নাগাদ এই সম্পর্ক আরও বেশী প্রসারিত হয়। বিদেশের সঙ্গে, ভারতের এই যে সম্পর্ক তা গড়ে উঠ্‌তো প্রধানতঃ দুটি উপায়ে। এক, ভারতের ধর্ম বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ ভারতের বাইরেও বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌তে থাকে। সেই সূত্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কও বেড়ে যেতে থাকে। আর একটি হল, ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে ভারতের ব্যবসায়ীগণ নানা দেশে যাতায়াত আরম্ভ করে। ফলে নানান্ দেশের সঙ্গে ভারতের নিত্য নতুন পরিচয় হতে থাকে। বিদেশের সঙ্গে ভারতের এই যে যোগাযোগ তা যেমন হত স্থলপথে, তেমনি হত জলপথে। স্থলপথে যোগাযোগ হয়েছিল মধ্য এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে, আর জলপথে দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার সঙ্গে।

ধর্ম ও ব্যবসার যোগসূত্র

॥ মধ্য এশিয়া ॥

মধ্য এশিয়া থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে এদেশে আসার পথ চিরকালই খোলা। এ পথ দিয়েই একদা এসেছিল আর্যগণ, তারপর এসেছিলেন আলেকজাণ্ডার, তারপর শক-হুন আরও কত।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যস্থলে তাক্‌লা মাকান ও গোবি মরুভূমি



অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু আগে এখানে এখনকার মত মরুভূমি ছিল না। এখানেই খোটান বলে একটি স্থান আছে।

প্রায় ষাট বছর আগে স্যার অরেল স্টাইন নামে একজন প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ এক বিরাট বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এখানে পাওয়া গিয়েছে বিশ হাজার পাণ্ডুলিপি, পাঁচশ' চুয়ান্নটি চিত্র। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক চরক ও সুশ্রুতের রচনাবলীও এখানে পাওয়া গিয়েছে এ সব থেকে সন্দেহ থাকে না এই সব অঞ্চলে এক সময় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

খোটান স্মৃতিচিহ্ন

খোটান থেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গিয়ে পৌছোয় চীনদেশে। চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার সম্পর্কে একটি গল্প আছে। প্রায় দুই হাজার বছর আগেকার কথা। তখন চীনের রাজা মিঙতি। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে বুদ্ধদেবকে দেখতে পান। তারপরই তিনি কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে আনানোর ব্যবস্থা করেন। তখনই খোটান থেকে তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে যান। এঁরা হলেন কশ্যপ, মাতঙ্গ এবং গোভরানা। এঁরাই চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করেন।

চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার

আমরা হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানতে পারি, যখন চীনে দেশে বৌদ্ধধর্মের নামে নানা অবিচার-অনাচার তখনই তিনি ভারতে এসে এই ধর্মের মূল সত্য জানতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাবার পর দেশে তাঁকে রাজার মত সম্মান জানানো হয় এবং তাঁর প্রচেষ্টায় সারা চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে যায়। কিন্তু চীনের বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধধর্মের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন দুই দেশের বুদ্ধদেবের চেহারায় অনেক অমিল দেখা যায়। আবার চীনেরা বৌদ্ধস্তূপের পরিবর্তে প্যাগোডো তৈরী করে সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করতো। যাই হোক চীন থেকেই এই ধর্ম জাপানে ও কোরিয়ায় বিস্তৃত হয়।

হিউয়েন সাঙ-এর কীর্তি

ভারতের আর এক নিকট প্রতিবেশী হল তিব্বত। বৌদ্ধধর্মের

সূত্রেই তিব্বতের সঙ্গে ভারতের গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় কত প্রাচীন কাল থেকেই। ভারতে যখন হর্ষবর্ধনের শাসনকাল, তখন তিব্বতের রাজা ছিলেন স্রং-স্থান-গ্যামেসা। তাঁর দুই রানীর একজন ছিলেন নেপালের রাজকুমারী, অন্যজন চীনের রাজকুমারী। এই দুই রানীই ছিলেন আবার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এঁদের প্রভাবে রাজাও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তিনি ভারতবর্ষ থেকে ধর্মপ্রচারক নিয়ে গিয়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মেরপ্রসার

তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণেই বিখ্যাত পণ্ডিত দীপংকর অতীশ ঐ দেশে গিয়েছিলেন বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে। জীবনের শেষ দিনগুলো দীপংকর ঐ দেশেই কাটান এবং ঐখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তিব্বতীগণ দীপংকরকে এখনো দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে। এখানে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের বলা হয় লামা। আর ধর্মগুরুর নাম দালাই লামা।

দীপংকরের অবদান



দীপংকর অতীশ

এ ছাড়া আফগানিস্থানেও ভারতীয় ধর্মের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। কাবুলের কাছে বামিয়ান নামক স্থানে অনেকগুলো বুদ্ধমূর্তি পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা পাওয়া গিয়েছে। অবশ্য তখন আফগানিস্থান ভারতের সঙ্গেই যুক্ত ছিল।

॥ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ॥

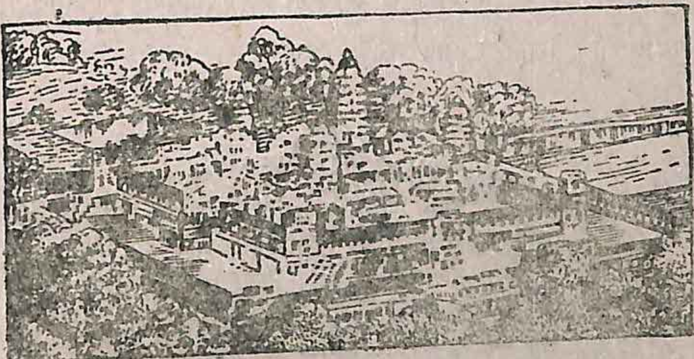
এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অনেকগুলো ছোট-বড় দেশ ও দ্বীপ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয়, সুমাত্রা,

জাভা, বালি এবং বোর্নিও। প্রাচীনকালে ভারতীয়গণ এই দেশগুলোকে বলতো সুবর্ণভূমি। তার কারণ বোধ হয় এই যে এই দেশের মাটি হল খুব উর্বরা এবং এই অঞ্চলে খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদও রয়েছে প্রচুর। ফলে, ব্যবসা করে ভারতীয়রা লাভও করতো ভাল।

সুবর্ণভূমি

এখন আমরা যে অঞ্চলকে বলি ইন্দোচীন, প্রাচীনকালে তাকেই বলা হত কাম্বোজ ও চম্পা। কাম্বোজের রাজধানী ছিল যশোধরপুর। এখনকার নাম ওংকার বাত। প্রায় হাজার বৎসর আগে রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ এখানে এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন। খুব সম্ভব এই মন্দিরটি হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। মাটি থেকে মন্দিরের চূড়া পর্যন্ত উচ্চতা হল দু'শ তেরো ফুট। সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী মন্দিরটির গায়ে নানা কারুকার্য।

ওংকার বাত



ওংকার বাত—ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত বৌদ্ধমন্দির

মন্দিরের পাশেই ওংকার থোম নামে একটি নগর ছিল। নগরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সপ্তম জয়বর্মণ। নগরের মধ্যে পিরামিডের মত এক মন্দির ছিল। মন্দিরের নাম বেয়নের মন্দির। মন্দিরের দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর শিবমূর্তি খোদাই করা। নগরের চারদিকে উঁচু প্রাচীর। ভেতরে পুষ্করিণী, চওড়া রাস্তা,

ওংকার থোম

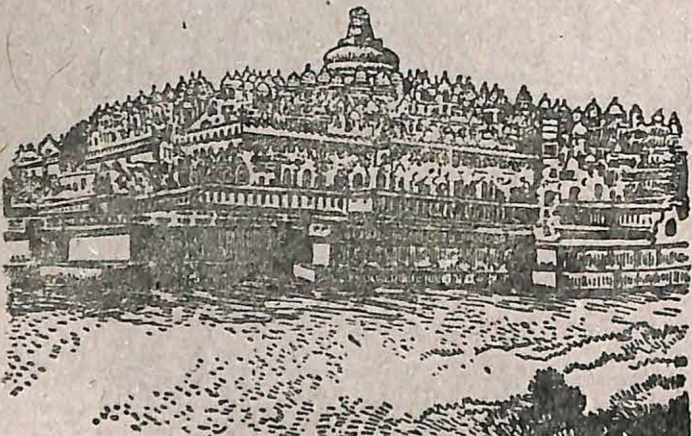
উঁচু তোরণ নগরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। মানুষের চিকিৎসার জন্য সেবাসদনও ছিল। এখানে প্রথমে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার বসতি স্থাপন করে। কুবলাই খানও এই শহরের খুব প্রশংসা করেন।

চম্পাতেও ভারতের সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানকার ,শাসকরা এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, দুর্ধর্ষ মঙ্গোল বীর কুবলাই খানের আক্রমণকেও তাঁরা আটকে দিয়েছিলেন। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই সমানভাবে প্রসার লাভ করে।

চম্পা

বর্তমানে যে অঞ্চলের নাম জাভা তখন বলা হত যবদ্বীপ। যে সময় এই অঞ্চল শাসন করতেন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা। কাশ্মীরের যুবরাজ গুণবর্মণের চেষ্টায় এই রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। এই বংশের রাজা বালপুত্রদেবের সঙ্গে পাল রাজা দেবপালের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। কুমার ঘোষ নামে এক বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচার্য ছিলেন এই বংশের রাজগুরু।

যবদ্বীপ



বরবুদুরের মন্দির

স্থাপত্য শিল্পে শৈলেন্দ্র রাজবংশের গভীর আগ্রহ ছিল। তার প্রমাণ হল বিখ্যাত বরবুদুরের মন্দির। একটি পাহাড়ের ওপর নির্মিত

এই মন্দিরটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের একটি। গোটা মন্দিরে বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী ছবির আকারে খোদাই করা আছে। নয়তলাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি যে-কোন দর্শককে বিস্ময়ে বোবা করে দেয়।

বরবুদুরের মন্দির

আর একটি লক্ষ্য করার মত বিষয় হল সমগ্র যবদ্বীপে ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের সীমাহীন জনপ্রিয়তা। আজ অবধি এই জনপ্রিয়তা এতটুকুও কমে নি। এখানকার রামায়ণ নাচ এখন পৃথিবী বিখ্যাত।

ভারতের আর এক অতি নিকট প্রতিবেশী হল সিংহল। যুগে যুগে এই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমশঃ বেশী গভীর হয়েছে। এই গভীরতা সম্ভব হয়েছে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে। সম্রাট অশোক তো নিজের পুত্র বা ভ্রাতা এবং কন্যাকে পাঠিয়েছিলেন এই বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্যই। এখানে হিন্দু ধর্মের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। আর এখন তো এখানকার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। চোল, চালুক্য ও পল্লবদের শাসনকালে এই দ্বীপটি আবার কিছুদিনের জন্য তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

সিংহল

যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র বংশের প্রথম প্রাধান্য স্থাপিত হয় সুমাত্রা দ্বীপে। চীনাদের বিবরণ থেকে জানা যায় ভারতের বাইরে সুমাত্রাই ছিল বৌদ্ধ বিদ্যাচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। শৈলেন্দ্র রাজাদের চেষ্টাতেই এখানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। এখানকার বৌদ্ধশাস্ত্র পণ্ডিত হলেন চন্দ্রকীর্তি। ইনি দীপংকর অতীশকে দীর্ঘ বারো বৎসর বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সুমাত্রা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় প্রভাব সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখতে হবে। মধ্য এশিয়ার মত এ অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারে ব্যবসায়ীগণ বিশেষ সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। ভারতীয় ধর্মের প্রভাবও যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য করেছিল,

তাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। অতিরিক্ত যা এই অঞ্চলে ঘটেছিল তা হল, ভারতীয়গণই এখানে বহু স্থানে রাজত্ব করেছিলেন। ফলে, ধর্মীয় ও ব্যবসায়িক যোগাযোগের সঙ্গে রাজশক্তির সাহায্য যুক্ত হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার অনেক ব্যাপক, প্রভাবও অনেক গভীরে, তাই স্থায়িত্বও দীর্ঘকালব্যাপী। এ অঞ্চলের লোকেরা ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-কেও ধরে রেখেছিল। বরং বলা যায়, রাজসভা এবং শহরবাসীদের মধ্যেই ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির বেশী কদর। তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক এখানে এসেছিল, সঙ্গে এনেছিল তারা তাদের নিজস্ব ভাবধারা। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির যে বিভিন্ন ভাবধারা তার পরিষ্কার পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই।

দঃ পূঃ এশিয়ার প্রভাবের কারণ

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এর থেকে প্রমাণ হয় ঐ সব দেশে ভারতীয় প্রভাব কত গভীরে। ঐ দুই ধর্মের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে অনেক মন্দির। এই মন্দিরগুলোতেও ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ছাপ খুবই স্পষ্ট।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হল কিভাবে? এখানে ভারতের সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ সম্ভব হল কেন?

২। চীনে বৌদ্ধধর্ম পৌছায় কেমন করে? সেখানকার বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের কি কি অমিল দেখা যায়?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। খোটান স্মৃতিচিহ্নের আবিষ্কারক কে? এই আবিষ্কার থেকে কি প্রমাণ হয়?

২। প্রাচীন ভারতীয়রা কোন্ অঞ্চলকে সুবর্ণভূমি বলতো? এবং কেন বলতো?

৩। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

ওংকার বাত, ওংকার থোম, বরবুদুর।

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নিচের বাক্যগুলো ঠিক কিনা বল :—

অ) বরবুদুর একটি হিন্দু মন্দির।

আ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি রাজসভা ও শহরবাসীদের কাছেই সমাদর পেয়েছিল বেশী।

ই) ভারতের দুই মহাকাব্যের অসীম জনপ্রিয়তা সিংহল দ্বীপে।

ঈ) ওংকার থোম পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের একটি।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

অ) মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয় —।

আ) খোটানের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেন —।

ই) কাম্বোজের রাজধানীর নাম ছিল —।

ঈ) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মন্দিরটি — অবস্থিত।

উ) — এখনো দীপংকরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। তিব্বতীয়গণ ধর্মগুরুকে কি বলে?

২। দীপংকর কার কাছে বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন?

৩। কুবলাই খান কোন্ শহরের খুব প্রশংসা করেছেন?

৪। শৈলেন্দ্র বংশের রাজগুরু কে ছিলেন?

৫। কোথাকার রামায়ণ নাচ পৃথিবী বিখ্যাত?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। এশিয়ার মানচিত্রে কোন্ কোন্ অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছিল শেড দিয়ে দেখাও।

॥ ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

ভারতের সুলতানী শাসনকাল

বিষয়-সংকেত ঃ কবি বলেছেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।" সত্যি, বিদেশীরাও তাই মনে করতো। এ দেশের সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের প্রচার ছিল জগৎ জুড়ে। তারই ফলে যুগে যুগে নানা হানাদার হানা দিয়েছে এদেশে। মুসলমানেরাও এভাবেই একদিন এসেছিল। কিন্তু তারপর কি হল? এবারে আমাদের সে-কথাই জানবার।

ভারতে সুলতানীযুগের আরম্ভ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দাস বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে গজনী বলে একটি ছোট্ট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের সুলতান মহম্মদ ঘুরী ভারত আক্রমণ করে যে-সব স্থান দখল করেন তার শাসনভার তিনি দেন সেনাপতি কুতুবুদ্দীন আইবকের ওপর।

দাস বংশ

মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দীন নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং ভারতে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশই দাস বংশ নামে পরিচিত। এই সময় থেকেই ভারতে সুলতান শাসনের আরম্ভ হয়।

দাস বংশের খ্যাতনামা সুলতানগণ হলেন, ইলতুৎমিস, সুলতানা রিজিয়া, নাসিরুদ্দীন এবং গিয়াসউদ্দীন বলবন। এর মধ্যে গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসনকালই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যেমন একদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে বিদেশী আক্রমণ বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

খলজী বংশ

দাস বংশের পর দিল্লীর সিংহাসনে আসে খলজী রাজবংশ। এই বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সুলতান হলেন আলাউদ্দীন খলজী। তাঁকে সমগ্র সুলতানী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতানও বলা হয়ে থাকে।

আলাউদ্দীনের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হল, তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত মিলে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ফলে, ছোট

ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান হল। দেশ-শাসন ক্ষেত্রেও রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা কমিয়ে সবাইকে সুলতানের অনুগত থাকতে বাধ্য করেছিলেন। তাছাড়া জিনিসপত্রের দর স্থির করে দেওয়াতে সাধারণ মানুষের খুবই সুবিধে হয়েছিল।


আলাউদ্দিন খলজী

খলজী বংশের পর তুঘলক বংশ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে। এই বংশের এক বিখ্যাত সুলতান হলেন মহম্মদ বিন তুঘলক। ইনি ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। অথচ তাঁর মত বিভিন্ন বিষয়ে এত পাণ্ডিত্য সে-সময় খুবই কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। আবার প্রজাদের তিনি ভালও বাসতেন খুব। কিন্তু একটু পাগলাটে ধরনের হওয়ার জন্য তিনি এমন সব কাজ করেছিলেন যে দেশের লোক তো তাঁর উপর খুশী ছিলই না, বরং কোন কোন সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিল।

তুঘলক বংশ

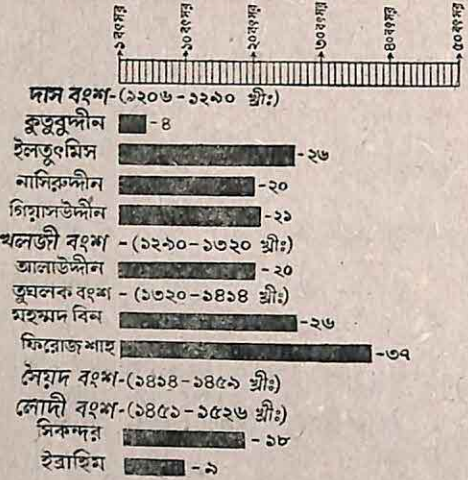

মহম্মদ বিন তুঘলক

তুঘলক বংশের পর আবার কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে নেমে এল অস্থিরতা। বিভিন্ন রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসনে বসল বটে, কিন্তু খুব অল্পদিনের জন্য। যেমন, তুঘলক বংশের পর এল সৈয়দ বংশ। টিকে থাকল মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর। তারপর এল লোদী বংশ।

লোদী বংশ

লোদী বংশের পর সিকন্দর লোদীর মধ্যে দেশ শাসন করবার মত কিছুটা সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম

দিল্লীর বিখ্যাত সুলতানদের রাজত্বকাল



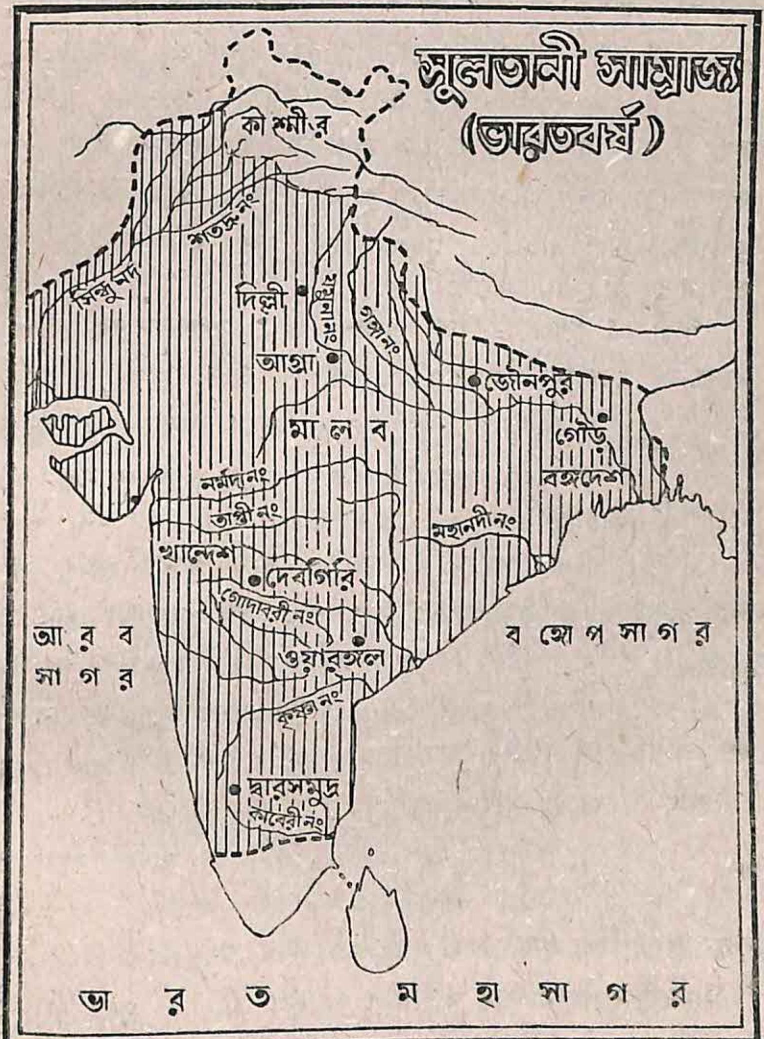
লোদীর সময় ভারতের ইতিহাসে আর এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হল। তাঁর সময়েই মঙ্গোল বংশজাত বাবর ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথে ইব্রাহিমের সঙ্গে বাবরের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইব্রাহিম পরাজিত হলেন, তার সঙ্গেই শেষ হল সুলতানী যুগের। আর জয়লাভ করেন বাবর এবং এই সঙ্গেই আরম্ভ হল ভারতে মোগল সম্রাটদের শাসনকাল।

প্রথম পানিপথের যুদ্ধ

॥ সুলতানী শাসনে ভারতবর্ষ ॥

ভারতে মুসলমানদের আগমন এক যুগান্তকারী ঘটনা। তারা যে কেবল এদেশের ক্ষমতাই দখল করতে চেয়েছিল তা নয়, তাদের আসার অন্য গুরুত্বও ছিল। মুসলমানদের আগে অন্য যেসব বিদেশী এসেছিল তাদের নিজস্ব কোন ধর্ম বা সংস্কৃতি না থাকায় তারা

অনায়াসেই এদেশে অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে যেতে পেরেছিল। কিন্তু মুসলমানদের ছিল নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি। তাই তাদের পক্ষে এখানকার দেশবাসীর সঙ্গে মিলে যাওয়া সহজ হল না। তবে তাদের ধর্ম ও



সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের ধর্ম ও সস্কৃংতির সংমিশ্রণ হয়েছিল নিশ্চয়ই। ফলে, পরিবর্তন যেমন এসেছিল মুসলমানদের মধ্যে, তেমনি এসেছিল ভারতীয়দের মধ্যেও।

॥ সমাজের গঠন ॥

তখনকার সমাজকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী, শহরবাসী ও কৃষক শ্রেণী। এদের মধ্যে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাই ছিল সর্বাধিক। অভিজাত বলতে বোঝায়,

অভিজাত শ্রেণী

সুলতান, রাজকর্মচারী, হিন্দু রাজা এবং জমিদারদের। এরা বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতেন। যেহেতু তখন শাসক ছিল মুসলমান, তাই মুসলমান অভিজাতদের ক্ষমতা ও মর্যাদা ছিল হিন্দু অভিজাতদের তুলনায় বেশী। এমন কি এদেশীয় মুসলমান এবং বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে বহিরাগতরাই বেশী সুযোগ-সুবিধে ভোগ করতো।

পুরোহিত শ্রেণী বলতে ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদের উলেমা উভয়কেই বোঝায়। সমাজে ও দরবারে এদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি

পুরোহিত শ্রেণী

ছিল। এদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভূমিদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ফলে, এরা বেশ সচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটাতো।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে এ সময় অনেক নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠে। শহরবাসীরা সাধারণতঃ ছিল ব্যবসায়ী এবং দক্ষ

শহরবাসী

কারিগর। এ যুগের কারিগরেরা নানা শিল্পকর্মে অতিশয় দক্ষ ছিল। তারা অভিজাতদের বিলাসিতার জন্য রকমারী জিনিস তৈরী করতো।

কৃষকেরা গ্রামেই বসবাস করতো। তাদের জীবনের খুব একটা

কৃষক

পরিবর্তন ঘটে নি। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছিল। অনেক হিন্দু এ সময় মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে নানা রকম সামাজিক বাধানিষেধ ছিল।

সমাজে নারীর না ছিল স্বাধীনতা, না ছিল মর্যাদা। পুরুষেরা বহু

নারীর স্থান

বিবাহ করতো। আর মেয়েদের জন্য ছিল বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা। তাদের শিক্ষালাভের কোন সুযোগও ছিল না।

॥ অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

ভূমি রাজস্ব

সুলতানী যুগে বেশীর ভাগ লোকই ছিল কৃষি-নির্ভর। সরকারী রাজস্বের বেশীর ভাগটাই আসতো ভূমি-রাজস্ব থেকে। ফলে, সাধারণ কৃষকদের ওপর কর আদায়ের জন্য নানারকম অত্যাচার করা হত।

জিনিসের দাম

কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য কথা হল, সে সময় জিনিসপত্রের দর যেন না বাড়ে সেদিকে সুলতানগণ বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। জিনিসপত্রের দর বেঁধে দেওয়া হত। সেই দর না মানলে ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।

শিল্প

বেশ কিছু লোক বিভিন্ন শিল্পে কারিগরের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতো। এরা সাধারণতঃ বিলাসদ্রব্য তৈরী করতো। এই দ্রব্য কিনতো অভিজাতরা। কখনো কখনো বাইরেও রপ্তানী করা হত। যেমন, এ সময় থেকেই ঢাকাই মসলিন কাপড় তৈরী আরম্ভ হয়। পরে এই কাপড় সারা পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করে।

ব্যবসা

দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল। ব্যবসা চলতো দু' ভাবেই—স্থলপথে ও জলপথে। তখন টাকার নাম ছিল তংকা। আর মণ, সের, ছটাকের হিসেবে জিনিসপত্র ওজন করা হত।

॥ রাজনৈতিক অবস্থা ॥

দেশের প্রধান অবশ্যই ছিলেন সুলতান। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাহায্যে তিনি সাম্রাজ্য শাসন করতেন। অভিজাতগণ অনেক সময় নানা ব্যাপারে সুলতানদের পরামর্শ দিতেন। কখনো কখনো সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে নিজেরাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠতেন। সুলতানের কাছাকাছি থাকতেন বলে অভিজাতরা ছিলেন বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

॥ ধর্মীয় জীবন ॥

ভারতে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেই নানা পরিবর্তন এসেছিল। যেমন, মুসলমান ধর্মের সুফী মতবাদ এবং হিন্দুধর্মের ভক্তি মতবাদ। আর এই পরিবর্তন এসেছিল ধীরে ধীরে দুই ধর্মের দীর্ঘকাল পাশাপাশি অবস্থানের মধ্য দিয়ে।

সুফী মতবাদ

সুফী মতের বিশ্বাসীরা গোঁড়ামি পছন্দ করতো না। তারা বলতো ভগবানকে ভালবাসতে, মানুষকে ভালবাসতে আর অপরের ধর্মকে মেনে নিতে। হিন্দু গুরুর মত পীরের কাজ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা নেবার কথাও তারা বলতো।



শ্রীচৈতন্য

ভক্তি মতবাদ

ভক্তি মতবাদও প্রায় একই কথা বলতো। তারাও স্বীকার করেছিল মানুষ ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে ভালবাসার মধ্য দিয়ে। এই মতবাদে বিশ্বাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ)। সারা বঙ্গদেশে ইনি কীর্তনের মাধ্যমেশ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। শিষ্যদের নিয়ে একসঙ্গে বসে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। সারাদেশ তিনি কৃষ্ণনামে মাতিয়ে তুলেছিলেন। বহু জায়গা ঘুরে বেড়াবার পর শেষজীবন



কবীর

তিনি পুরীতে কাটিয়েছিলেন। তিনি যাগ-যজ্ঞ, মূর্তিপূজা বিশ্বাস করতেন না।

আর একজন ভক্তি মতবাদে বিশ্বাসী হলেন কবীর (আঃ ১৪৪০-১৫১৮ খ্রীঃ)। ইনি কাশীতে এক তাঁতী পরিবারে জন্মেছিলেন। ধর্মীয় ভেদাভেদ তিনি মানতেন না। তাঁর মতে ভগবানকে ভালবাসাটাই বড় কথা। এজন্য তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর দোঁহা রচনা করেন।

ভক্তিবাদে বিশ্বাসী আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এ সময়। ইনি হলেন শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খ্রীঃ)। পাঞ্জাবে এক গ্রামের হিসাবরক্ষকের সন্তান ছিলেন তিনি। চাকরি করা তাঁর পছন্দ ছিল না। অসংখ্য ফকির ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি নানা জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন। তারপর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষাগ্রন্থের নাম আদিগ্রন্থ। নানকেরও শিক্ষা হল ভগবানকে ভালবাসা। তিনি জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য একই রান্নাঘর থেকে খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মকে মিলিত করে যে নতুন ধর্মের কথা বলেন তাই শিখ ধর্ম নামে পরিচিত।



গুরু নানক

ভক্তি মতবাদের প্রভাব

আমাদের মনে রাখতে হবে, ভক্তি মতবাদ কেবল ধর্মীয় মতবাদই ছিল না। এই মতবাদের একটি সামাজিক প্রভাবও ছিল। এই মতবাদ একদিকে যেমন জাতিভেদ প্রথা মানতো না, অন্যদিকে তেমনি নারীকে বিশেষ সম্মান দিত।

॥ **ভাষা ও সাহিত্য** ॥

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলনের প্রভাব দেখা যায় সাহিত্যেও। মুসলমানগণ এদেশে পারস্য ভাষা নিয়ে এসেছিল। পরে এই ভাষার সঙ্গে ভারতের হিন্দু ভাষার সংমিশ্রণে এক নতুন ভাষার জন্ম হয়। এ ভাষাই হল উর্দু ভাষা।

উর্দু ভাষা

এ সময় সংস্কৃত ভাষার চর্চা ছিল খুবই সীমিত। তাই আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ যেমন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে থাকে সাধারণ মানুষের সুবিধের জন্য। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল এ সময়।

অনুবাদ সাহিত্য

॥ **শিল্প চর্চা** ॥

স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পারসিক রীতি এদেশে নিয়ে আসে। এই রীতির সঙ্গে ভারতীয় রীতির মিলনে এক নতুন স্থাপত্য-শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন খিলান, গম্বুজ এগুলো পারসিক রীতি, আবার আভ্যন্তরীণ কারুকার্য হল ভারতীয়। এ ধরনের শিল্পরীতির নমুনা হল, কুতুব মিনার, ফিরোজ শাহ কোটলা, তুঘলকাবাদ ইত্যাতি।

নতুন শিল্পরীতি

চিত্রশিল্প ও সংগীতের ক্ষেত্রেও সুলতানী যুগের অনেক অবদান। সেতার, সারেংগী, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহার এ সময় থেকেই আরম্ভ হয়। গান গাইবার পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন হয়।

॥ **সমসাময়িক যুগে বঙ্গদেশ** ॥

লক্ষণ সেনের পর থেকেই বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও সুস্থির অবস্থা আসে নি। তবুও এর মধ্যে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এবং হোসেন শাহের শাসনকাল খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। বিশেষ করে হোসেন শাহের সময় থেকেই বাংলার নবযুগ আরম্ভ হয়েছিল বলা যায়।

বঙ্গদেশে মুসলমানগণ প্রথমে অত্যাচারী থাকলেও ক্রমশ তারা হিন্দুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু মুসলমানদের জন্যই হিন্দু সমাজে কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। এজন্য পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। আবার জাতিভেদ প্রথার এই কঠোরতার ফলেই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করতে থাকে।

সমাজ ব্যবস্থা

বাংলা ভাষার অনুশীলনে হোসেন শাহের শাসনকাল খুবই উল্লেখযোগ্য। এই সময় মালাধর বসু 'ভাগবত' বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন। রচিত হয় কৃত্তিবাস রামায়ণ এবং মঙ্গলকাব্য।

বাংলা ভাষা

আবার চৈতন্যদেবের চেষ্টায় বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম বহুল প্রচারিত হয়। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা এই ধর্ম হ্রাস করতে চেষ্টা করে। এ সময়েই কীর্তন গানের ব্যাপক প্রচলন হয়। জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস এ সময়েই বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন।

এ সময় বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিল যথেষ্ট ভাল। এখানকার সম্পদ বাইরে যেত না বলে জিনিস-পত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। অবশ্য সাধারণ কৃষকদের কষ্টের মধ্যেই দিন কাটাতে হত। রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের ভয়ে তারা তটস্থ থাকতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

॥ সুলতানি যুগের শাসন ব্যবস্থা ॥

সুলতানী আমলে শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সুলতান। তিনি আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদে বিলাস-ব্যসনের মধ্যে থাকতেন। তাঁকে সাহায্য করতেন আমীর ও ওমরাহগণ। সুলতানের শক্তির উৎস ছিল সৈন্যবাহিনী। দেশের কোথায় কি ঘটছে জানবার জন্য থাকতো গুপ্তচর বিভাগ। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হত। সাম্রাজ্যের প্রধান আয় ছিল ভূমি রাজস্ব থেকে।

দেশের বিচার বিভাগের প্রধানকে বলা হত কাজী। প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত উজীর। তিনি সুলতানকে পরামর্শ দিতেন, রাজস্ব আদায় করতেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব রাখতেন।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

দাস বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাসে যে মুসলমান শাসনের সূচনা হল, অস্বীকার করার উপায় নেই, সেই সঙ্গে আরম্ভ হল দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য ও শৃংখলা। বিশাল সাম্রাজ্য গঠন এবং সুবিন্যস্ত শাসন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই এই ঐক্য ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে এদেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল।

॥ অনুশীলনী ॥

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন :—

১। ভারতে সুলতানী যুগ আরম্ভ হয় কখন? এই যুগের সূত্রপাত করেন কে? কিভাবে তিনি নতুন যুগ আরম্ভ করেন?

২। সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয় কাকে? তিনি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

৩। সুলতানী যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল?

৪। ভক্তি মতবাদ বলতে কি বোঝায়? এই মতবাদ কি কি স্বীকার করতো না? এই মতবাদের দু-এক জন সমর্থকের পরিচয় দাও।

৫। সুলানী শাসনে বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন এসেছিল? সে সময় বাংলা ভাষার কি উন্নতি হয়েছিল?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন :—

১। নিচের শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—
সুফী, পীর, দোঁহা, আদিগ্রন্থ, কাজী, উজীর।

২। সুলতানী যুগের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত সুলতান কে ছিলেন? তাঁর পরিণতি কি হয়েছিল?

৩। ভারতে মুসলমানদের আসা এক যুগান্তকারী ঘটনা কেন?

৪। কোন্ যুদ্ধকে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধের গুরুত্ব কি?

৫। শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে? তিনি কিভাবে শিখ ধর্ম প্রবর্তন করেন? তিনি জাতিভেদ প্রথা দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

(গ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। নীচে প্রদত্ত 'ক' স্তম্ভের বক্তব্যগুলোকে 'খ' স্তম্ভের সঙ্গে মেলাও :—

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অ) তখন অভিজাত বলতে বোঝাতো	অ) উর্দু ভাষা।
আ) পুরোহিত শ্রেণীর অসীম প্রভাব ছিল	আ) নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি।
ই) মুসলমানেরা এদেশের মানুষের সঙ্গে মিলে যেতে না পারার কারণ।	ই) সুলতান, রাজকর্মচারী। জমিদার প্রভৃতিদের।
ঈ) মুসলমানেরা পারস্য থেকে নিয়ে	ঈ) সমাজের ওপর।
উ) পারস্য ও হিন্দি ভাষার মিলনে তৈরী হয়	উ) নতুন শিল্পরীতি।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

অ) — সারা বাংলা দেশ কৃষ্ণ নামে মাতিয়েছিলেন।

আ) কবীর ছিলেন একজন — ছেলে।

ই) সুলতানী স্থাপত্য শিল্পের নমুনা হল —।

ঈ) সুলতানী শাসনের শীর্ষে ছিলেন —।

উ) মালাধর বসু — বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন।

ঊ) —হল পারস্য ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণ।

(ঘ) মৌখিক প্রশ্ন :—

১। পারস্য শিল্পরীতির কি বৈশিষ্ট্য ভারতে দেখা যায়?

২) কবীর কি মানতেন না?

৩) শিখজাতির ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

৪) বঙ্গদেশে বাংলা ভাষায় অসাধারণ উন্নতি হয় কখন?

৫) রঘুনাথ শিরোমণি কি রচনা করেছিলেন?

(ঙ) কর্মশিক্ষার নির্দেশনা :—

১। একটি ভারতের মানচিত্রে আলাউদ্দীন খলজীর সাম্রাজ্য-সীমা নির্দেশ কর।

২। চৈতন্যদেবের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংগ্রহ কর।

৩। কবীরের দুটি দোঁহা খুঁজে বের কর।

৪। সুলতানী স্থাপত্য-নিদর্শন দেখার জন্য দিল্লী ভ্রমণের একটি পরিকল্পনা রচনা কর।

॥ চতুর্দশ অধ্যায় ॥

ভাটার টানে মধ্যযুগ

বিষয়-সংকেত : নদীর জোয়ার-ভাটার মতই মানব-সভ্যতার উত্থান-পতন। এই উত্থান-পতনের মূল মন্ত্রটি হল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের টানে মানুষ তার হাতে গড়া জিনিস ভেঙে আবার নতুন করে গড়তে লাগে। এই পরিবর্তনের টানই এনেছে মানুষের সভ্যতায় এক অন্তহীন গতিবেগ। এই গতিবেগেই মধ্যযুগের পর সূচিত হল মানব-সভ্যতার নতুন দিক।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে যেমন সূচিত হয়েছিল প্রাচীন যুগের সমাপ্তি এবং মধ্যযুগের সূত্রপাত, তেমনি পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতনে চিহ্নিত হল মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল যেমন রোম

সূচনা

নগরী, তেমনি পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনোপল। রোম নগরী যেমন জার্মান উপজাতিদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হল, তেমনি কনস্টান্টিনোপল আজ আরবীয়দের হস্তগত হল। রোম নগরের পতনের তুলনায় কনস্টান্টিনোপল পতনের ফলাফল কিন্তু অনেক বেশী ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল।

কনস্টান্টিনোপল যে কেবল পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বা এক প্রচণ্ড সমৃদ্ধ নগরী ছিল তা নয়, ছিল প্রাচীন গ্রাক সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক সংরক্ষণ কেন্দ্র। ইউরোপ এই মহান গ্রীক সভ্যতার

কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফল

কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সেই কনস্টান্টিনোপলের পতন যখন আজ ঘটলো আরবীয় হাতে তখন তার প্রতিক্রিয়া হল দুদিক থেকে। প্রথমতঃ, ধর্মযুদ্ধের সময় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি যখন পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তারা দীর্ঘকাল পর আবার নতুন করে তাদের নিজস্ব প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পায়। দ্বিতীয়তঃ, কনস্টান্টিনোপলের

পতনের সময় বহু ইউরোপীয় জাতি যারা ঐখানে স্থায়িভাবে বসবাস করতো, পালিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয় আবার ইউরোপে। তারা ফিরে আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিল প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতি ও সভ্যতার নানা নিদর্শন। ফলে, নিজেদের পুরানো ঐতিহ্যকে আবার নতুন করে জানার এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল ইউরোপের সম্মুখে। এই সুযোগ ইউরোপ হারালো না।

হারালো না যে তার প্রমাণ পাওয়া গেল ক্রমশঃ ধীরে ধীরে। এই প্রমাণকেই ইতিহাসে নবজাগরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নবজাগরণ কথাটির অর্থ হল মানুষের চিন্তাজগতে এক বিরাট পরিবর্তন। মধ্যযুগে ধর্ম মানুষের চিন্তাজগতে এমন এক অনড় বোঝার মত চেপে বসেছিল যে তারা স্বাধীনভাবে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে কোন কিছু বিচার করে দেখতে পারতো না। অন্ধভাবে কোন কিছুকে গ্রহণ করার পরিবর্তে বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে কোন কিছুকে যাচাই করার যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে এল তাকেই বলা হয়েছে নবজাগরণ।

মানসিক পরিবর্তন

চিন্তাজগতে স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আরও বেশী অজানাকে জানতে চাইলো। মানুষ ক্রমশঃ হয়ে উঠলো অনুসন্ধানী। পৃথিবীর সব কিছুকে জানার, চেনার, বোঝার আগ্রহে মানুষ এখন অধীর হয়ে উঠলো।

ভৌগোলিক আবিষ্কার

এই অধীরতা থেকেই মানুষ একদিন অজানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। অসংখ্য দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর অনুসন্ধানের ফলে ইউরোপের বাইরে নানা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হতে লাগলো। যেমন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আবিষ্কার করলেন আমেরিকা মহাদেশ। ভাস্কো-দা-গামা আবিষ্কার করলেন ইউরোপ থেকে ভারতে জলপথে আসার পথ। এইসব আবিষ্কারের ফলে নতুন নতুন দেশে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠলো। ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের এক বিরাট সুযোগ

তৈরী হল। পৃথিবীর নানা দেশে ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মধ্যযুগে যে ধর্মীয় অন্ধত্ব মানুষকে এক অন্ধকার জগতে আবদ্ধ রেখেছিল—তা থেকে মুক্তি পেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে দুর্বার বেগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হল। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হল, তার সুযোগ নিতে বিভিন্ন দেশ আরও বেশী রকমারি জিনিস উৎপাদন করতে উৎসাহিত হল। ফলে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যে কলকারখানা গড়ে তুলতে তারা অনুপ্রাণিত হল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার

শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সব সৃষ্টি হয়েছিল এই সময়েই। সমগ্র ইউরোপে ইটালী হয়ে উঠলো নতুন জ্ঞান-চর্চার পীঠস্থান। এই সময়কার জ্ঞান-তাপসদের লক্ষ্য ছিল একটাই। তা হল মানব জীবনের জয়গান গাওয়া। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলা। তাই এদের বলা হয় মানবতাবাদী। এই সময়ের বিখ্যাত স্রষ্টারা হলেন, সাহিত্যে পেত্রার্ক, বোকাচিও, শেকসপীয়র, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য শিল্পে রাফাএল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, রাষ্ট্রনীতিতে মেকিয়াভেলি প্রভৃতি। এঁদের সৃষ্টি এতই বিস্ময়কর যে, তা আজও আমাদের অবাক করে দেয়।

এ সময়ের বিখ্যাত কয়েকজন

মানুষের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন তার স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল তখনকার ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে। এতকাল পর্যন্ত ধর্মের নামে ইউরোপের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রের প্রধান হিসেবে পোপ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতেন। গড়ে উঠেছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। কিন্তু আজ সেই ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পর্কেই প্রশ্ন দেখা

দিল। ধর্মীয় অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করলেন জার্মানীর এক সন্ন্যাসী, নাম মার্টিন লুথার। তিনি পোপ ও চার্চের সমস্ত অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তাই তাঁকে এবং তাঁর সমর্থকদের বলা হল প্রোটেস্টাণ্ট বা প্রতিবাদীর দল।

রাজনৈতিক পরিবর্তন

এই প্রতিবাদের ফলে ক্রমশঃ পোপের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। তারই সঙ্গে ভেঙ্গে যেতে থাকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। তার জায়গায় গড়ে উঠতে লাগলো জাতিগত বিভিন্ন রাষ্ট্র। যেমন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি। কিন্তু এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সব সময় খুব সহজভাবে সম্ভব হয় নি ; যেমন—হল্যাণ্ড।

এই সময় হল্যাণ্ড ছিল স্পেনের শক্তিমান রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনে। হল্যাণ্ডের অধিকাংশ লোক প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু ফিলিপ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। তাই তিনি হল্যাণ্ডবাসীদের উচিত শিক্ষা দিতে ডিউক আলভা নামে এক নির্মম অত্যাচারী ব্যক্তিকে সেখানকার শাসনকর্তা করে পাঠান। আলভা অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই সময় হল্যাণ্ডে একজন নিঃস্বার্থ মহান বীরের আবির্ভাব হয়। ইনি হলেন প্রিন্স উইলিয়াম। এই উইলিয়ামের নেতৃত্বে দীর্ঘকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সংগ্রামে সাধারণ মানুষ যেভাবে নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন তা ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা

ইংলণ্ডও কিন্তু নিজেকে পোপের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করেছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। তখন ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী। তিনি প্রথমে পোপের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই পোপের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দিল। হেনরী তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চাইলে পোপ তাতে সম্মত হলেন না। ফলে হেনরী ক্রুদ্ধ হয়ে পার্লামেন্টে আইন করে পোপের

ইংলণ্ড ও পোপের বিরোধ

সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করলেন। এখন থেকে তিনি নিজেই হলেন ইংলণ্ডের ধর্মবিষয়ের প্রধান। ইংরেজী ভাষায় বাইবেল প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। এভাবেই পোপের সঙ্গে এতকালের পুরানো সম্পর্ক ইংলণ্ডের ছিন্ন হয়ে গেল।

● এই অধ্যায়ে মনে রাখার কথা ●

ঘটনার দিক থেকে কনস্টান্টিনোপলের পতন থেকেই মধ্যযুগের অবসান। উপলব্ধির দিক থেকে কুসংস্কার ত্যাগ করে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার সামর্থ্য মানুষ যখন অর্জন করে তখন থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত। এই আধুনিকতার প্রভাব পড়লো মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে।

॥ অনুশীলনী ॥

১। কোন্ ঘটনাকে মধ্যযুগের অবসান বলে চিহ্নিত করা হয়? কেন করা হয়?

২। নবজাগরণ বলতে কি বোঝায়? নবজাগরণের ফলে কি পরিবর্তন হল?

৩। মানুষ ভৌগোলিক আবিষ্কারে উৎসাহী হল কেন? কয়েকজন বিখ্যাত আবিষ্কারকের নাম বল। এইসব আবিষ্কারের ফল কি হয়েছিল?

৪। মানবতাবাদ কাকে বলে? এই মতবাদের লক্ষ্য কি ছিল? কয়েকজন বিখ্যাত মানবতাবাদীর নাম লিখ।

৫। প্রোটেস্টান্ট কারা? এদের প্রধান নেতা কে ছিলেন? প্রোটেস্টান্ট মতবাদের ফলে ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এল?

৬। হল্যাণ্ডের স্বাধীনতার নায়ক কে? তখন হল্যাণ্ড কার অধীনে ছিল? তাঁর সঙ্গে হল্যাণ্ডবাসীর বিরোধ সৃষ্টি হয় কেন?

৭। ইংলণ্ডের সঙ্গে পোপের সম্পর্কের অবসান কেন এবং কিভাবে হয়?

———

মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ঃ সময়ানুক্রমিক

সময়	স্থান	ঘটনা
৩২৩-৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দ	বাইজেণ্টাইন	কনস্টানটাইনের শাসনকাল
৪১০ "	রোম	এলারিকের রোম আক্রমণ
৪৫১ "	ফ্রান্স ও ইটালী	এটিলার ফ্রান্স ও ইটালী আক্রমণ
৪৫৫ "	রোম	গাইসারিকের রোম লুণ্ঠন
৪৭৬ "	রোম	পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন
৫২৭-৫৬৫ "	বাইজেণ্টাইন	জাস্টিনিয়ানের শাসনকাল
৫৪২ "	ভারতবর্ষ	মিহিরগুলের মৃত্যু
৫৫০ "	ভারতবর্ষ	গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন
৫৭০-৬৩২ "	মক্কা ও মদিনা	হজরত মহম্মদের জীবনকাল
৬০৬ "	ভারতবর্ষ	হর্ষবর্ধনের শাসনকাল ও গৌড়ে শশাংকের রাজ্যস্থাপন
৬১০-৬৪২ "	ভারতবর্ষ	চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসনকাল
৬১৮-৯০৭ "	চীন	তাঙ বংশের শাসনকাল
৬২২ "	মদিনা	হিজরি সনের আরম্ভ
৬২৯ "	চীন	হিউয়েন সাঙ-এর ভারত যাত্রা
৬৩৭ "	ভারতবর্ষ	গৌড়রাজ শশাংকের মৃত্যু
৭৮৩-৮৮৫ "	ভারতবর্ষ	পাল-রাষ্ট্রকূট-প্রতিহার দ্বন্দ্ব
৭৮৬-৮০৯ "	আরব	হারুণ-অল-রসিদের শাসনকাল
৮০০ "	রোম	শার্লামেনের অভিষেক
৯৬০-১২৮০ "	চীন	সুঙ বংশের শাসনকাল
৯৮০ "	ভারতবর্ষ	দীপংকর অতীশের জন্ম
১০৫৩ "	তিব্বত	দীপংকর অতীশের মৃত্যু
১০৯৬ "	জেরুজালেম	প্রথম ধর্মযুদ্ধ
১১২০ "	ফ্রান্স	প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

সময়	স্থান	ঘটনা
১১৭৫-১২২৭ ,,	মঙ্গোলিয়া	চেঙ্গিজ খানের জীবনকাল
১১৮৯ ,,	জেরুজালেম	তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ
১১৯২ ,,	জাপান	সোগান পদের প্রতিষ্ঠা
১২০২ ,,	বাইজেণ্টাইন	চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ
১২০৯ ,,	ইংলণ্ড	কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা
১২৬০ ,,	ভারতবর্ষ	সুলতানী যুগের সূচনা ও দাস বংশের প্রতিষ্ঠা
১৩৬০-১৩৯২ ,,	চীন	কুবলাই খানের শাসনকাল
১৪৫৩ ,,	কনস্টান্টিনোপল	কনস্টান্টিনোপলের পতন